শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রকাশক ঃ—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ
(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য্য)
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পঃ বঃ।

প্রথম-সংস্করণ
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি (শ্রীব্যাসপূজা)
৫ গোবিন্দ ৫২৫ শ্রীগৌরাব্দ
২৮ মাঘ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ খৃষ্টাব্দ

প্রাপ্তিস্থান
গ্রন্থবিভাগ
মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ-শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া, পঃ বঃ।
পিন-৭৪১৩১৩ ☎(০৩৪৭২)২৪৫২১৬

শ্রীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট
৭০-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কোলকাতা-২৬
☎(০৩৩) ২৪৬৫৭৪০৯

ভিক্ষা ঃ — ৫০ টাকা
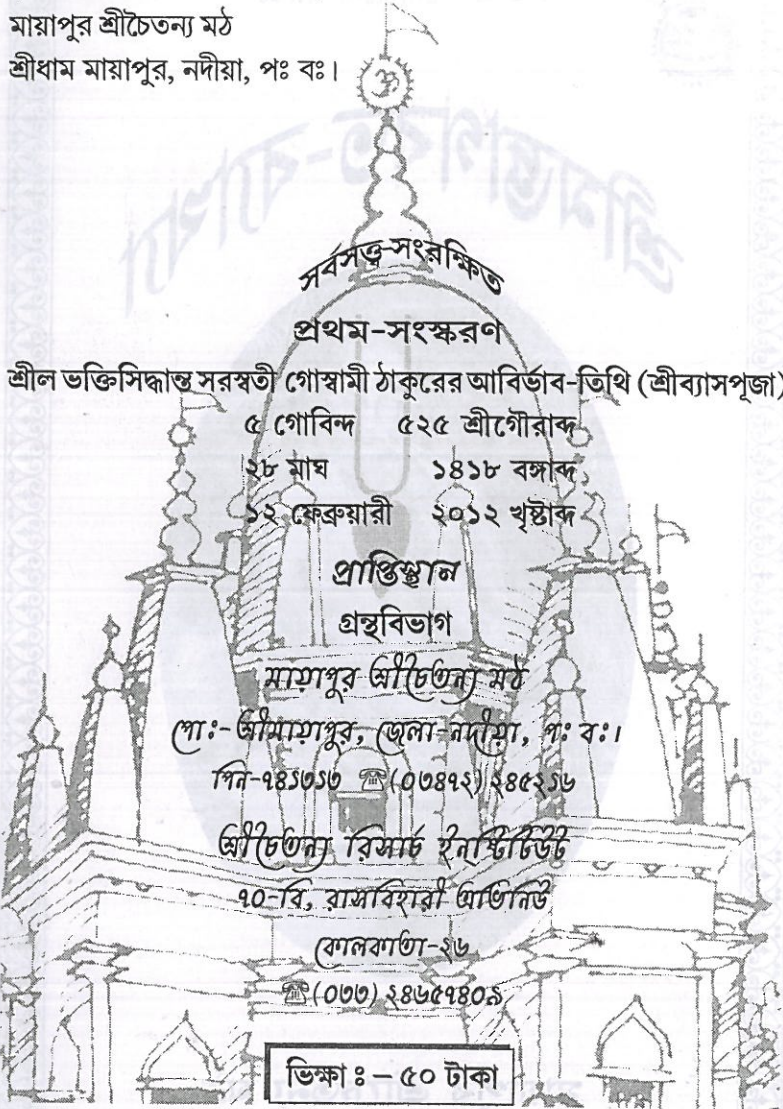
মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে
শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবতের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবন ছিল ভাগবতময়। তিনি জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা করে গেছেন; তা' অমূল্য সম্পদ বিশেষ। তাহা যদি আমরা পাঠ করে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম এবং আমাদের যদি অনুশীলনপর জীবন হত, তাহা হইলে মনুষ্যজীবনের পঞ্চমপুরুষার্থ (কৃষ্ণপ্রেম) অনায়াসেই লভ্য হইত। আমাদের পারমার্থিক জীবনের মঙ্গলের জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কত ভাবে চেষ্টা করে গিয়েছেন কিন্তু বিষয়বস্তু হল অপ্রাকৃত, অক্ষজ-ভূমিকায় বাস করে সেই অপ্রাকৃত বস্তু লাভ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই বলেছেন—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর", তথাপিও যদি আমরা সর্বতোভাবে শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে শ্রৌতপন্থায় মাত্র উহা অনুভব করা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু-রায় রামানন্দ সংলাপে যখন রায় রামানন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।৩ শ্লোক "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব ...." এই কথা বলেছেন, তখনি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রৌতপন্থাই একমাত্র পথ; তা' স্বীকার করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ধারাবাহিকভাবে ভাগবত ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্যের জন্য সেটির কিছু কিছু অংশ তাঁহারই প্রকাশিত তদানীন্তন বাংলা সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'তে ১৭.৮.১৯৩৫ সাল হইতে ৭.১২.১৯৩৫ তাং পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ যত্নপরবশের সহিত সাপ্তাহিক গৌড়ীয় থেকে তাঁহাই সংগৃহীত করিয়া এই গ্রন্থটি প্রকাশ করবার বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। শ্রীমান্ রামানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিমল কৃষ্ণ দাস সমস্ত অংশটি মঠের কম্পিউটার-এ কম্পোজ করিয়াছেন। শ্রীঅনাথবন্ধু দাসাধিকারী ও শ্রীশ্বেতদ্বীপ দাসাধিকারী চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে প্রুফ সংশোধন করে যাহাতে নির্ভুলভাবে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নশীল হন। এই সেবাকার্য্যের জন্য তারা সকলেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ লাভ করবে।

যাঁহারা এই পুস্তকটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই পারমার্থিক মঙ্গল লাভ করিবেন।

— ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি
১৯ মাধব, ১৩ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী, ২০১২ খৃষ্টাব্দ।

সূচীপত্র

শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

উপক্রমণিকা

প্রথম দিবস

তাং ২৯শে শ্রাবণ, বুধবার, শ্রীবলদেবাবির্ভাব দিবস;

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা।

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।"

"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।।"

যে বস্তু আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁর সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হতে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তৎকার্যে (তৎপ্রাপ্তিচেষ্টায়) নিযুক্ত করলেও আমরা সফল-মনোরথ হব না। কারণ, আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান করতে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা করতে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তাছাড়া আমরা রোগ শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নেই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হতে উদ্ধার করতে পারেন;

একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না।

এক সময় শ্রীদাস গোস্বামী প্রভু বলেছেন---যাঁর প্রসিদ্ধ কৃপার দ্বারা নামের শ্রেষ্ঠতা, মন্ত্র, শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্ম, শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রেষ্ঠপুরী শ্রীমথুরামণ্ডল, শ্রীবৃন্দারণ্য, গিরিরাজ গোবর্ধন, কৃষ্ণক্রীড়াস্থলী শ্রীরাধাকুণ্ড এবং শ্রীরাধিকামাধবের অনুগ্রহ পেয়েছি, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নমস্কার করি।

যেহেতু আমি দেখছি, "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ"---

সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাঁর অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্ম-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁর স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাঁর অনুসন্ধান সম্ভব? কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় তাঁর প্রাপ্তি সম্ভাবনা হয়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁর সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এতগুলি ব্যাপার যার কৃপায় পাচ্ছি, তাঁর উপাস্য কি? তাতে আমরা জানি---

> "আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
> রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
> শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
> শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।"

চৈতন্যদেব যে বিষয়ের মীমাংসা করেছেন, তার বিরোধী বিচার জগতে থাকতে পারে না। জগতের অন্যান্য মতবাদ নানা বিবদমান চিন্তা-স্রোতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হলে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি।

চৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হতে সংগ্রহ করেছেন? "আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশতনয়"। "আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্"---শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা---ভগবানের আরাধনা। ভগবান পূর্ণবস্তু। যেকাল পর্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যেকাল

পর্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার---'কর্তাহহং' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান করতে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হয়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্‌রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নি, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নি। তিনি বলেন---"আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন," তিনি বলেন--সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা মথুরেশ দ্বারকেশ বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য---যাঁরা ব্রজে যেতে পেরেছেন, তাঁদেরই উপাস্য। তাঁদের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে---স্বানুভবানন্দ বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরূপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি, চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্মাদি বৈভবাবতারসমূহ যাঁর অংশ-কলা, ইঁহাদের সকলের ভগবত্তা যাঁ হতে, সেই অখিল রসামৃতমূর্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁর লীলার পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হয়েছে। যাঁরা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে গোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হোক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁর প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবাগ্রহাতিশয্য যাঁর জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামনসৈকত-কদম্ব প্রভৃতিরও সেব্য যিনি সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হোক।

> "যৎকিঞ্চিৎ-তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
> সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম্।
> শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ প্রকটিতং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
> ব্রহ্মাদেরপি সংস্পৃহেণ তদিদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে।।"

কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হোক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জগতের

বস্তুদর্শনের দ্রষ্টৃহিসাবে তাহাদের ভোগকর্তা আমি,—এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্বক্ষণ গ্রাস করেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় করে যে দুর্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা হতে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

ভগবান ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধর্মী। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম বদ্ধজীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়।

"কর্মণাং পরিণামিত্বামাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ করে সেই সংগৃহীত জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু। কর্মের কর্তৃত্ব-ধর্ম বজায় রেখে যে বেদানুশীলন, তা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি।।"

পরা ব্যতীত যে বিদ্যা তা ভোগ্য বিদ্যা—অপরা বিদ্যা। তাতে বিমূঢ় হয়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। বিরিঞ্চি- লোক পর্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে এটা নশ্বর। বর্তমান দৃশ্য জগতের—চতুর্দশ ভুবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা' প্রতি মুহূর্তেই আমাদিগকে প্রতারিত করে—বিবর্তগর্তে ফেলে দেয়,—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ;" বিচার অনুধাবন করলে জানা যায় যে আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে।

ভগবানের অনুগ্রহ না হলে প্রকৃত দর্শন হয় না। সুতরাং আমাদের বিচার করা আবশ্যক—'আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্।' অখিল-রসামৃত-মূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধামবৃন্দারণ্য সেই জিনিষটা কৃপা করে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁর পাঁচ প্রকার আশ্রয়জাতীয় সেবক। ইহজগতে সেবাবিমুখ হয়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান হেতু কর্মাগ্রহিতা, কিন্তু তার মূল্য

অন্ধকপর্দক। কর্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্বনাশ করে। যাঁদের করুণায় আমাদের সকলের সর্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁদের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্বক্ষণ অখিলরসামৃতমূর্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নেই। পঞ্চরসরসিক ব্যতীত তাঁর সেবা আর কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ং প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকলব্যূহ, অবতার, অন্তর্যামী প্রভৃতির একমাত্র মালিক—মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, কারণ-গর্ভক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎসাদি বৈভব অবতারসমূহ যাঁর অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। যার ভগবত্তা হতে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবানই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা করেছেন, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেন নি। যেমন উদ্ধব বলেছেন—

"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাননে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।"

শ্রুতিগণ বিশেষরূপে যাঁকে অনুসন্ধান করেন, সেই যে মুকুন্দ-পদবী পরম মুক্তাবস্থায়ও যিনি সেব্য, তাঁকে সেবা করবার জন্য গোপীসকল স্বজন পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমরা স্বজন পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নই—ব্রজে যাবার জন্য ব্যস্ত হই না। 'স্বজন' বলি যাদের, তারা তাৎকালিক স্বজন। স্বজনাখ্য ব্যক্তিগণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা আর্যপথ (সভ্যসমাজে যে পথ গৃহীত হয়) তা পর্যন্ত ত্যাগ করে মুকুন্দপদবী গ্রহণ করেছিলেন। ব্রজের গুল্ম-লতা-ওষধি-সমূহের মধ্যে অবস্থান করলে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্ম জগতের কথা অনাত্মজগতের কথা নয়; তাদিগকে জড়ের বিচারদ্বারা আচ্ছাদিত করে নষ্ট করা উচিৎ নয়। বৃন্দাবনের

চিন্ময় ব্যাপারে ইহজগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাকলেও উহা তা নয়। ইহজগতের ভোক্তৃ-ভোগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হচ্ছে, তাতে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন করতে গেলে প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম হবে, অপ্রাকৃত সহজধর্ম হবে না।

"রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"--ব্রজবধূগণ যে-রূপে কৃষ্ণসেবা করেছেন,---তটস্থ হয়ে বিচার করলে জানা যায়, সেইটিই সর্বোত্তম। এটার প্রমাণ কি? না, শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ। 'প্রমাণ' বলে অসংখ্য কথা বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্র বলে থাকেন; কিন্তু অপরা বিদ্যার অনুশীলনকারীর বিচার মলযুক্ত বলে তা গ্রহণীয় নয়। এটা হচ্ছে পিপাসাতুরের নিকট দূরস্থিত জলাশয় ভ্রম---মরীচিকায় জল ভ্রান্তি। অর্থই নিত্য প্রার্থণীয়, অনর্থ তাৎকালিক, নানা ভ্রান্তি-উৎপাদক। বাস্তববস্তুই গ্রাহ্য, অবাস্তব গ্রহণীয় নয়। অনেকের বিচারে নির্বিশেষবাদই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটি সমল---অশুদ্ধ; কিন্তু ভাগবত অমল প্রমাণ, ইহাতে অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতামূলে আচরণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষারূপ জাল-জুয়াচুরি কৈতব নেই। পাণ্ডিত্যপ্রতিভা-দ্বারা যাঁরা বেদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ-উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা অপস্বার্থপরতায় দীক্ষিত বলে তাঁদের প্রমাণ কৈতবযুক্ত; সুতরাং তাঁদের কথা গ্রাহ্য নয়।

'ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক "ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং" আমাদের আলোচ্য হোক। ভাগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে ---ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নেই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। "শুশ্রূষুভিঃ" বলে একটি বিষয় বলেছেন; শুশ্রূষু অর্থাৎ সেবাধর্মযুক্ত ব্যক্তি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া,"---ঘোড়ার সেবা করলে 'সহিস', কুকুরের সেবা করলে 'ভাঙ্গী', লোহার কাজ করলে 'লোহার' বা 'কামার', স্বর্ণের কাজ করলে স্বর্ণকার হব, আর ভগবানের সেবা করলে 'ভক্ত' হওয়া যাবে। জগতে যে-সকল কথা নিয়ে মনুষ্যজাতি ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ গ্রহণাভিলাষী হয়ে 'ভাগবত'কে পণ্যজ্ঞান না করে ভাগবত হয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু 'ভাগবত' হয়ে গেছি---ভাগবত পড়ে ফেলেছি মনে করলে সর্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুল খেলা নয়---অভিনয় মাত্র নয়। ভগবৎসান্নিধ্য---বাস্তবসত্যের সান্নিধ্য লাভ করতে

হবে---তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে হবে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্বুদ্ধি হলে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হয়ে যায়; ভক্তির দ্বারাই ভগবান লভ্য হন। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি বলে কর্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, কর্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতায় বাস করলে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি না। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারোত্থ অনুস্বার-বিসর্গপড়া ভাষাজ্ঞান---শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হবে না। যাঁরা ২৪ ঘন্টা ভগবৎসেবা করছেন, তাঁদের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হবে ---"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" তাঁদের কাছে জানতে হবে ভাগবত কি জিনিষ, কোন কোন অক্ষরাত্মক হয়ে কোন কোন শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে; কোনগুলি ভাগবতের কথা নয়, তাও বুঝা যাবে।

এই ভাগবত কাহার প্রিয়, কি বস্তু, ইহাতে কিরূপ জ্ঞান প্রদত্ত হয়, জ্ঞানবিরাগভক্তিযুক্ত, নৈষ্কর্ম্য বিচার ইহাতে আছে কি না এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ-পঠন- বিচারণ-ফলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয় কি না প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষেই এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়---

"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবাণাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।"

অভক্তি-দ্বারা বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি হবে না। সেইজন্য 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ ভক্তি অবলম্বন পূর্বক---এই কথা বলেছেন। কৃষ্ণ, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" একথা যে অর্জুনকেই বলেছেন, তার পরে আর সেটার কোন মূল্য থাকবে না, তা নয়। সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ করতে হবে। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। সেবোন্মুখ জিহ্বায় অর্থাৎ ভক্তিমানের জিহ্বায় ও ওষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হবেন। স্বয়ংরূপ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু এমন নন, যে অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হবেন।

বেদান্তভাষ্যকার বলেছেন—"অনন্তকল্যাণগুণৈকবারিধির্বিভুশ্চিদানন্দঘনো ভজৎপ্রিয়ঃ।"

উহা রজঃসত্ত্বাদি গুণের কথা নয়। গুণাতীত, 'নির্গুণ' শব্দে যাঁকে বলেছে। তাহা এই গুণকে থামিয়ে দেওয়া নয়—অসদ্গুণ নিরাসমাত্র নয়। হরির ক্রিয়াকে কালক্ষোভ্য ক্রিয়ার অন্তর্গত মনে করলে 'অধোক্ষজ' বলা হচ্ছে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচারে অতীত অধোক্ষজের কথা। 'হরি' শব্দে মসূরের ডাল, সিংহ, চোর ইত্যাদি কোষোক্ত শব্দ লক্ষ্য করলে হবে না। 'নির্গুণ হরি' বললে সিংহকে বুঝতে হবে না,—হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ। নৃসিংহ, মৎস্যাদিকে 'হরি' বলাই সঙ্গত। তাঁদিগকে 'হরি' বললে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মল দূর হয়।

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"

পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িকজগতের চিন্তাস্রোত বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুষার্থ—বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্য—প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম' শব্দের লক্ষীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃত মূর্তি ভগবদ্‌বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই 'প্রেম'।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

ভাগবত শ্রবণ করে নিজে পাঠ করতে হবে। অমুকে পাঠ করবে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করবো, তা নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক করতে হবে, অবিস্মৃতির বিচার করা দরকার। শুধু বিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হলে বিমুক্তি হবে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বিমুক্তি নয়।

"মুক্তির্যঃ প্রস্তরহায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ।
গৌতমং তং বিজানীথ যথাবিত্থ তথৈব সঃ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ করে পুরাণ হয়েছে তা নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁদের প্রিয় নয়; বিষ্ণু-পাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁরা ভিক্ষুক, চেতনের, পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁরা, তাঁরা বৈষ্ণব। তাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ বলে অবলম্বন

করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা করতে হবে। ঈশ-কেন-কঠাদি শ্রুতিসকল, ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাবে—যদি ভগবান স্মরণপথে আসেন, নচেৎ অপরা বিদ্যা হয়ে যাবে।

"যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে"

সমল মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান দ্বারা ভাগবত বিদিত হন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ "পরা জ্ঞানের" কথা নেই, যাতে নৈষ্কর্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে। "বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেৎ" যারা দেখছেন, তাদের নৈষ্কর্ম্য হচ্ছে না। জ্ঞানবিরাগভক্তি সহিতই নৈষ্কর্ম্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু করব না। ভক্তিতে যদি নির্বিশেষরাহিত্য এসে যায় তাহলে চিৎসাহিত্য হল না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তার কথা ভাগবতে বলেন নি। সর্বাপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যর উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। অমুক ব্যক্তি বড় ভক্ত, কিন্তু জড়বিলাসী—এরূপ কথা সোনার পাথরবাটীর মত। জড়বিলাসযুক্ত ভাগবত পাঠ হলে তদ্বিনিময়ে বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই ভাল।

মুর্খের ভাগবত পাঠ ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জড় বিলাসীর ভাগবত পাঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এ প্রসঙ্গে "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" শ্লোকটি আলোচ্য। এক এক গ্রাস অন্ন গ্রহণ করলে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুপাতে হতে থাকে, সেইরূপ ভক্তি জ্ঞান ও বৈরাগ্য একত্রে উদিত হয়। যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিক বিচারে ছেড়ে দেন না। যেকাল পর্যন্ত না জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদিত হবে, ততদিন কর্মাগ্রহিতা যাবে না। ভগবদিতর বস্তুর সেবাকে 'ভক্তি' বলে না। দেশভক্তি, অধ্যাপক ভক্তি, খণ্ডপদার্থের প্রতি ভক্তি—অন্য রকম কথা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি ভক্তি হওয়া চাই, যাতে নিত্যত্ব আছে, আনন্দ আছে, খণ্ডিত নয়। যে পরিমাণে ভক্তি হবে, সেই পরিমাণে জ্ঞান বৈরাগ্য স্বতই উদিত হবে।

ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্ ভাগবত চতুর্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহে। তাহা পঞ্চমবর্গের সৌন্দর্য-দর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। আমরা ভাগবত আলোচনায় অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বারা তার আলোচনা হবে। নচেৎ

ভোগীর অনুভূতিতে আমাদের বিপন্ন করবে। উপসংহারে বলতে চাই---শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করলে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। আর তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি, দ্বাদশরসে তাঁর সেবা হয়ে থাকে। তাঁর অবতারগণ পূর্ণরসের সেব্য নন। যিনি তাঁর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

দ্বিতীয় দিবস

(তাং ৩০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার; স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা)

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।

আমরা গতকল্য শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তাতে দুটি বিষয় আলোচিত হয়েছিল। একটী---ধর্ম-অর্থ-কাম---ভোগের এই ত্রিবিধ ফল এবং মুক্তি বা মোক্ষ---বন্ধন হতে মুক্তি---অশান্তির হস্ত হতে পরিত্রাণলাভরূপ ত্যাগের ফল--চতুর্বর্গ প্রার্থনা; আর একটী কথা পঞ্চম পুরুষার্থ 'প্রেমা'। চতুর্বর্গের প্রার্থনায় যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা ভাগবত পড়ে ফল পান না। 'প্রেমা' অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতিসংগ্রহ যাঁদের প্রয়োজনীয় বিষয়, তাঁরাই ভাগবত পাঠের ফল পান। 'প্রেমা' সবচেয়ে বড় জিনিষ বলে আলোচ্য হলে ভাগবত পড়ার আবশ্যক হয়।

আমরা পাঁচপ্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান বলে মহাপ্রভুর মুখে শ্রবণ করেছি--

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ।।"

ঐগুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হতেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন করতে পারি। পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্‌বস্তুর লাভ ঘটে। আমাদের বর্তমান সময়ে ভাগবত-শ্রবণ বলে একটী কার্য পড়েছে। এমন গ্রন্থ শুনে লোকের বেশী কি লাভ হবে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে---এসমস্ত পূর্বপক্ষের আলোচনা হওয়া আবশ্যক---বিষয়টি ভাল করে জানা দরকার।

অতি পূর্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল, তাঁরা উপাস্যবস্তু---নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝতেন। কিন্তু কালে দেখা গেল, সকলের উপাস্য, আরাধ্য

এবং উপাসনা বা আরাধনা এক নয়; তাঁদের অনেকগুলি গন্তব্য স্থান, প্রাপ্য বস্তুও রকম রকম। এজন্য বহু দেবতার উপাসনা প্রচলিত হল। অতি প্রাচীনকালে 'হংস' বলে একটী মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁরা এই জগতে বাস করে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, পূজ্যের পূজা করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থপথের পথিক বলে অভিহিত হতেন। পূর্বে বৈষ্ণবগণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত-সম্প্রদায়ের অতি পূর্বকালের কথা আলোচনা করলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংসের' কথা জানতে পারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল—একায়নপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্বৈদিকযুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল বলে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা' অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংসগণের আলোচ্য বিষয় সংগৃহীত হয়েছে যাতে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জায়গা হতে যে জ্ঞান সংগ্রহ হত, তাকে পঞ্চরাত্র বলা হয়। পুষ্কর, হয়শীর্ষ, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিক ও গ্রন্থ।

ভগবানের উপাসক 'ভাগবত' বলে প্রসিদ্ধ। যে সময়ে শ্রীব্যাস শম্যাপ্রাসে শ্রীশুকদেবকে ভাগবত অধ্যয়ন করান নি, সে-সময়ের কথা বলছি। সে-সময়ও 'পারম-হংসী সংহিতা', 'সাত্বত সংহিতা' প্রভৃতি কথা আমরা ব্যাসের লেখনী হতে পাই। বেদের অর্থ পুরণার্থ বেদব্যাস পুরাণ রচনা করেন। পুরাণে প্রাচীন কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতকেও ব্যাসরচিত পুরাণবিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একায়নপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ, ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়।

একায়ন-স্কন্ধ ও বহুয়ন শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের স্কন্ধ-শাখা। চ্যুতগোত্রীয় ঋষিগণ বহুয়ন-শাখাবলম্বী, অচ্যুত-গোত্রীয়গণই একায়নপন্থী। বহুয়নশাখা একায়ন স্কন্ধ হতে স্বতন্ত্র। একায়ন পদ্ধতিতেই পূর্ণ সমন্বয় বিচার ও একপথের বিচার। সত্যযুগে যে কথা ভাগবত বলেছেন, সেই কথার বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলে বেদবিভাগ ও বর্ণ বিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদ-ধর্মক্ষয়ে বেদ বিভক্ত হয়ে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে বর্ণবিভাগ হয়েছিল। ত্রেতার পূর্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংসজাতির অন্তর্গত ছিলেন।

নিষ্ক্রিয় হয়ে যাঁরা পরমার্থপথে অগ্রসর হতেন, তাঁরাই পরমহংস। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী মত ক্রমশঃ প্রবল হবার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্-সামাদি বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়।

আমি প্রারম্ভিক কথা বলছি। হংসজাতি কাশ্যপহ্রদের (কাস্পিয়ান সি) নিকট এশিয়া নামক স্থানে বাস করে 'আর্য' বলে অভিহিত হন। অগ্ন্যাদিদেবের উপাসনার প্রত্যক্ষ বিচারে অবস্থিত হয়ে বিষ্ণুর উপাসনাও তজ্জাতীয় মনে করেন। বিষ্ণু হতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞান করে ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতাখ্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উল্লেখ এবং উহার উপাসনাকাণ্ডে ঐসকল দেবতার স্তবাদি দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ শ্রবণ করবেন যাঁরা, তাঁদের এ সমস্ত কথার দরকার আছে, নতুবা শ্রীমদ্ভাগবতে নবাভ্যুদিত মধ্যযুগীয় গ্রন্থমাত্র ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। একায়নপদ্ধতিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র বেদ। উপনিষদে একায়ন, মহাভারত, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শব্দ পাওয়া যায়। ভাগবতের প্রাক্ ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগ্বৈদিকযুগের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায় যে, ঋগ্বেদের পূর্বেও মানবজাতি সভ্য উপাসক ছিলেন, তাঁরা একায়নপথাবলম্বী হয়ে সহজ বিষ্ণুভক্তি বা বৈষ্ণবতার বিচারেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ত্রেতার প্রারম্ভে স্থানে স্থানে একায়ন বিচার শ্লথ হওয়ায় বেদবিভাগ ও বেদাঙ্গাদির প্রচার হয়। পূর্বে 'একায়ন', 'পঞ্চরাত্র', 'সাত্বত' প্রভৃতি শব্দ ছিল। একায়নের কথা এখন ন্যূনাধিক বর্তমান ইতিহাসে বিলুপ্ত; উহা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হলে জানা যায় যে, প্রাগ্বৈদিকযুগে বিষ্ণুভক্তির কথা ছাড়া অন্য কথা ছিল না, ত্রেতারম্ভ হতেই অন্যান্য কথা বিস্তারলাভ করেছে। আমাদের এদেশে কিছুকাল পূর্বে যে কেবল বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বাস করতেন, তা নয়; সাত্বতব্রাহ্মণেরাও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির কথাই প্রবল ছিল। তাঁদেরই বংশধর এখন 'সাত্বতী' কথা থেকে তার অপভ্রংশ 'সাতশতী' বা শাশ্বতী বলে আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কান্যকুব্জ হতে পঞ্চব্রাহ্মণ আসবার পূর্বে বঙ্গে সাত্বত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বাস করতেন। প্রত্যক্ষ জড়-বিচারপর বৌদ্ধরাজগণের প্রবল পরাক্রমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ন্যূনাধিক স্তব্ধীভূত হয়। নানাবাধা অতিক্রম করেও ভগবৎ-কৃপায় সেই পুরাতন জৈবধর্ম পুনরায় প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হচ্ছে।

'পুরাণ' বলে যাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন, তাঁরা প্রাগ্‌বৈদিকযুগের সাত্বত-স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কি আলোচনা করতেন, তার আলোচনা করুন। পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত অকৃত্রিম বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবত নাসিকাকুঞ্চনের বস্তু নন। শ্রীনারায়ণ ঋষি নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস আবার শুকদেবকে এই ভাগবতী কথা বলেন। ব্যাসের শম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম বৈঠক বসেছিল। শ্রীশুক সেখানে ভাগবতের আলোচনা করেছিলেন। সেই সময় হতেই 'ভাগবত' শব্দের প্রয়োগ, তৎপূর্বে পরমহংস, সাত্বতগণের আলোচ্য পারমহংসী, সাত্বতসংহিতা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আমরা ইতিহাস আলোচনার সময় পাই।

সাতটি কল্পে ব্রহ্মার সাতটি জন্ম হয়েছিল। আমাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় তা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে,—মহাভারতেই একথা আছে। বর্তমানে যে শ্রীমদ্‌ভাগবতগ্রন্থ প্রচারিত আছে, তাতে প্রাগ্‌বৈদিকযুগের উপাসনা-প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। বৈদিকযুগের অর্থাৎ সত্যযুগের পরবর্তী সময়ে ঋক্, সাম, যজুঃ—এই বেদত্রয়ীতে যে সমস্ত বিচারপ্রণালীর কথা আছে, যা আবার সূক্ষ্মভাবে সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদাদিতে আছে, তাতে বৈষ্ণবধর্মের কথাই বলা হয়েছে। তবে ক্রমশঃ মানুষের উপাসনার চিন্তাস্রোত যেরূপ, তাতে মৎস্যকূর্মাদি অবতার-ক্রমে বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্তিত হয়েছে, কল্কির সময় তা থামবে, রোহিনেয় রামের পরে একটী (বুদ্ধ) হয়েছে, আর একটী (কল্কি) হবে। ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের বশবর্তী হয়ে বিষ্ণুর এই সকল অবতার-প্রাকট্য। এঁরা নিত্য বৈকুণ্ঠে আছেন। কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি কৃপালু হয়েতাঁদের এদেশে আসা বা জীবহৃদয়ে অবতরণই—অবতার। কিন্তু তাঁদের অপ্রকটলীলা-ভূমিকা পার্থিব প্রাকৃত অবরভূমিকা নহে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে কোন প্রকার অবরতা আরোপিত হতে পারে না। যাবতীয় অবরতা ঐহিক সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। হিরণ্যকশিপু নিত্য বৈকুণ্ঠে নেই। তবে তার ভাব সেখানে নিয়ে গেলে বিষ্ণুকর্তৃক লীলাপোষণ জন্য তার ভাববিধ্বংস পরিজ্ঞাত হতে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পার্থিব ত্রিগুণান্তর্গত পদার্থবিশেষ, সেদেশে লীলা-পুষ্টি জন্য তত্ত্বচিন্ময় ভাবমাত্র বর্তমান; তথায় জড়াধিষ্ঠান নেই। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা বলে দুটি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়-জগতে

বৈভবাবতার-সমূহের প্রাকট্য হলেও অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁরা পূর্ণভাবে আছেন। এটা জড়জগৎ, উহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমিকার পার্থক্য-বিজড়িত হয়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সেখানে কোন অনুপাদেয় অবরবিরোধীধর্ম নেই। সব ভাবই তথায় আছে, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও প্রপঞ্চের ন্যায় প্রেমের অভাব নেই, প্রত্যেক কার্যই বিষয়ের প্রীতিজনক; অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধময় নহে। বিরোধ, অভাব, অনুপাদের, হেয়, পরিচ্ছিন্নের অবরতা আপেক্ষিকতা বলে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নেই। এই দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠকথা বলারও শ্রবণের জন্যই গৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদন-নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছে। স্থানে স্থানে শ্রবণ-সদন নির্মাণ করা হচ্ছে, যাতে করে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়ে অন্য কথায় বৃথা শ্রদ্ধা থেমে যায়। কেউ বলেন,—শ্রীমদ্ভাগবত তন্তুবায়গণের আলোচ্য পুঁথি, উহা স্বাধ্যায়-নিরতবিচারপর ব্রাহ্মণদিগের বিচার্য গ্রন্থ নয়! অনেকসময় আবার শুনি, কেউ কেউ মহাপ্রভুকে 'শচীপিসির ছেলে'—এই পর্যন্ত সম্মান দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, পুরাণের কথা বাজে কথা, আষাঢ়ে গল্প, পুরানো কথা, ওকথা শুনে কি হবে! কেউ বলেন, ভাগবত বোপদেব রচিত। যদি তা হয়, তা হলে যে বোপদেব ভাগবত রচনা করেছেন, তাঁর কত বড় হওয়া উচিত, তা একবার ভাগবতখানি বিচার করে দেখলে হয়। ভাগবতবিরোধী-সম্প্রদায়ে শ্রীমদ্ভাগবতকে যে ব্যাসের রচিত গ্রন্থ নয় বলে দোষারোপ করা হয়, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা দশম শতাব্দীর গ্রন্থবিশেষ বলে আধুনিকতা প্রমাণ করে গর্হ্যণযোগ্য করা হয়, তার মূল কারণ অনুসন্ধান শ্রবণ-সদনেই বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয় হওয়া দরকার। অন্যান্য জিহ্বাগহ্বরের নানা বিতণ্ডা, ভেকজিহ্বার কোলাহল সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হওয়া উচিত। সেজন্য অনেক সময় মনে করি শ্রবণ-সদনে কিছু ভাগবত আলোচনা হোক—বর্তমানে যার মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে, তাঁর প্রচুর পরিমাণে আলোচনারূপ আদান-প্রদান হোক। ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজনসরবরাহের উপায়রূপে সময় কাটাবার অন্যতম জ্ঞানে বা অর্থ বিনিময়ে ভাগবত শ্রবণের বিচার হলে তাতে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা আশানুরূপ ফল হবে না। শুদ্ধ সারস্বত-শ্রবণ-সদনের যত বৃহত্ত্ব লক্ষ্য করব, যত আলোচনা বাড়বে,

যত বড় বড় টাউনহল, বড় বড় অট্টালিকা শ্রীগৌড়ীয় মঠের ভাগবত শ্রবণ-সদন হবে, ততই লোকের মঙ্গল হবে, সকলে হরিকথা আলোচনা করবে, সর্বত্র হরিকথাময় হয়ে যাবে—সেদিনই বিশ্ব পূর্ণ-সুখময় হবে। মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্, পরমার্থ-শিক্ষা-সদনই ভাগবতমঠ। শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থানুশীলন ব্যতীত মঠের আর কোন কার্যই নেই। ভক্তিমঠে ভগবৎসেবানুরাগবিশিষ্টগণই বাস করুন, সেবাবিমুখ বা সেবাবিরোধীর এস্থানে প্রয়োজন নেই, অন্যাভিলাষী, কর্মিজ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তগণ এস্থানে বাসের সদুদ্দেশ্য বুঝবেন না। ভক্তিমঠে পঞ্চরাত্রবিধিতে মন্ত্রদ্বারা বিবিধ উপচারে ঠাকুরের অর্চন হয়, ভোগ হয়, ভগবদ্ভোগ্য বস্তু তাঁতে সমর্পিত হলে তদুপভুক্ত বিচারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। প্রাগ্‌বৈদিকযুগের আলোচ্য ভাগবতবিচার অনুসরণ করে বৈদিক পণ্ডিতাভিমানিগণের বর্তমান বিচার থেকে অবসর পাওয়া দরকার। ভগবানের কথাদ্বারাই সব সুবিধা হবে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চলবে। "কিংবাপরৈঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্বপক্ষরূপে সমস্ত বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করে তার সম্পূর্ণ অকর্মন্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হয়েছে যে, তারা 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠের স্থানে বা বারবণিতাদিগের নর্তনকীর্তনস্থানে ভাগবত পাঠলাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ করছে, যেন ভাগবতও তাদের ন্যায় অনর্থবৃদ্ধিকারিজনগণের ঐ জাতীয় কর্ণরসায়নের বস্তু! মানুষের ভগবানের সেবা বিচার এতটা কমে গিয়েছে যে, শতকরা ৯৯.৯৯ ..... পর্যন্ত বলিলেও ভ্রম হবে না। ভাগবতের কথাই যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু (negligible)। কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শতভাগই ভাগবতের কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা প্রবল হবে, তা না হয়ে উল্টো বিচার হয়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার থেমে যাক। ভাগবতের কথা আলোচনা না করলেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব বলে—সংসার বলে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হবে। যারা জন্ম-জন্ম ধরে ভগবৎপ্রসঙ্গ বিমুখ হয়ে সংসারে দুঃখকষ্ট—অশান্তি ভোগ করছেন, তাঁরা কি এখনও স্বাস্থ্যলাভ করার জন্য চেষ্টা করবেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানা প্রবৃত্তি-দ্বারা

চালিত হয়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ করতে হয়; একমাত্র ভগবৎকথাশ্রয়েই পরমা শান্তি লাভ হতে পারে। মনুষ্যজাতির একথা কি এখনও বিচার্য হবে না?

শ্রীব্যাস তাঁর পুত্র শুকদেবকে ভাগবত পড়িয়েছিলেন, যে শুকদেব সংসারে প্রবিষ্ট হন নি। কত উদারতাসহ তাঁকে ভাগবতের কথা বলতে পেরেছিলেন—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট না থাকায় বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচবোধ করতে হয় নি, এমন একটী শ্রোতা শুকদেব। ব্যাস শুকদেবকে বলবার পূর্বে নারদ থেকে, নারদ আবার নারায়ণঋষি থেকে এই ভাগবত শুনেছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মদেবর্ষিবাদরায়ণ' ক্রমে অস্মদগুরু পারম্পর্যে যে কথা আছে, সেই একই কথা। শ্রীভগবানের নিজ উক্তি হতে আমরা জানতে পারি,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।
তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ।।
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্বাস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ।।
যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথা প্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি।"

(ভাঃ ১১।১৪।৩,৫-৭)

এই ভক্তির কথাই কাল প্রভাবে প্রলয়েবিনষ্ট হয়েছিল। ভগবৎকর্তৃকই আদিকবি বিরিঞ্চির নিকট বেদনামে পরিচিত ভাগবতধর্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হয়েছিল। তাঁদিগের হতে—পিতৃগণ হতে দেবদানব-গুহ্যকগণ, মনুষ্য, সিদ্ধগন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, কিংদেব-নাগগণ, রাক্ষসগণ, কিম্পুরুষগণ লাভ করে স্ব-স্ব রজঃসত্ত্বতমোগুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিচিত্র বিচারপুষ্ট বাক্যসকল বলেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতিগণের মধ্যে বিভিন্ন বেদবিচারে বিভিন্নতা এসেছে।

প্রথমে ভাগবতের কথাগুলি শ্রীশুক তাঁর ছাত্রজীবনে শম্যাপ্রাস মঠে আলোচনা করেন। ব্যাস তাঁর অকৃতদার কুমারধর্মী পুত্র শুকদেবকেই ভাগবত বলেছিলেন। তিনি আর সংসারে প্রবিষ্ট না হয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় বিবিধ শ্রোতা পেয়ে তাঁদের সেই কথা বললেন। যিনি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়েরাজ্য ঐশ্বর্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট হয়ে পরমার্থের জন্য পার্থিব শরীরত্যাগের যত্ন প্রদর্শন করেছিলেন, এমন একজন ব্যক্তিকে শ্রীশুক ভাগবতকথা বলবার শ্রোতৃরূপে পেলেন। শ্রীব্যাস শুকদেবকে অত্যন্ত সাহসের সহিত---সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে "সঙ্গং ন কুর্যাৎ শোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ" প্রভৃতি তীব্র কথা বলতে পেরেছিলেন। আবার শুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিৎকে পরম সাহসে সেই কথা বলতে পেরেছেন। পরীক্ষিৎ তাঁর অধ্যাপক শুকের নিকট যা শুনেছিলেন, তা মজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত শুকরতল ভুখারহেড়ি বা ভোপা নামক স্থানে। এখানেই ভাগবতের দ্বিতীয় বৈঠক হয়। তৃতীয় বৈঠক নৈমিষারণ্যে। শৌণকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি সূতগোস্বামীর নিকট ভাগবত কথা শুনেছিলেন। সূত চারণ শ্রেণীর লোক। পূর্ব ইতিহাস গান করে বলার জন্য তাঁরা শিক্ষিত হতেন। আজকাল ঘটকেরা যেমন পূর্বপুরুষের কথা বলেন, সেই প্রকার শ্রীসূত শুকপরীক্ষিৎ সংবাদ ষাটহাজার ঋষির কাছে শুকস্থানে শ্রুতবাক্যসকল অভিনয়ের মত গান করেছিলেন। ঋষিগণ কলি সমাগত দেখে সহস্রব্যাপী এক যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। ভগবদিচ্ছায় শ্রীসূত সেস্থানে উপস্থিত হলে ঋষিরা তাঁকে ভাগবতবক্তৃরূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীসূত শ্রীশুকমুখে যে কথা শুনেছিলেন, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই আঠার হাজার শ্লোকের পাঠনকার্য আরম্ভ করে দিলেন।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরোভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।"

এদিকে কর্মকাণ্ডীয়েরা বেদত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে আচ্ছন্ন হয়ে বেদের আশ্বলায়ণ, সাংখ্যায়ণাদি শাখা নির্ণয় করে তাই নিয়ে ব্যস্ত হলেন; সব চেয়ে বুদ্ধিমান ভাগ্যবান যাঁরা, তারা সুপ্রাচীন একায়ণ পদ্ধতি আশ্রয় করলেন।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। সনৎকুমার হতে আর এক ব্রহ্মা-নারদাদি অস্মদ্ গুরুপারম্পর্যের কথা আপনারা শুনেছেন। ধরা দ্বারা গঠিত

শ্রীমূর্তি---পরম ঐশ্বর্য্যময়ী মহালক্ষ্মী-পূজার বিচার থেকে যে অর্চনপথ,--- ঈশ্বরভাব যার অনুগত, সেই পদ্ধতি সনৎকুমার হতে এসে পৌঁছেছে।

ভাগবতের বা বৈষ্ণবের আগের কথায় হংস পরমহংস সংজ্ঞা। ত্রেতায় যখন জাতির বিভাগ হল, তখন চ্যুত ও অচ্যুতগোত্রীয়ের একটা পার্থক্য ছিল। যেমন আমরা ভাগবতে দেখতে পাই---

"সর্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক।

অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ।।"

অচ্যুতগোত্র ভাগবত পরমহংসকুল, আর চ্যুতগোত্র ঋষিকুল। এঁরা উভয়েই পরম সম্মানিত। এঁদের উভয়েরই মধ্যে পরজগতের আলোচনাছিল। যাঁদের পরজগতের কথা আলোচনা আছে, তাঁদের খাজনা দিতে হত না, তাঁরা বিনামূল্যে মঠমন্দিরে বাস করতেন। আলাদা করে বিত্তসংগ্রহের প্রয়োজন হত না। পৃথিবীতে সকলেরই কর্তব্য সাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা করা। পৃথুমহারাজের সময়ে এই বিচার ছিল। তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। ঋষিবংশের কোন দণ্ড নেই। কিন্তু তাই বলে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণেতর আচারে প্রবৃত্ত হলে বড়ই কলঙ্কের কথা। পৃথুর সময় তা ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রৌতগৃহ্যসূত্রানুসারে চলতেন। আর অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের পরমার্থানুশীলনই প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেউই ফৌজদারী বা দেওয়ানী কোন অপরাধই করতেন না। ইহা আমরা ভাগবতে পাই। ভাগবতালোচনা ঋষিবংশের মধ্যেও ছিল। যখন সংহিতা বলা হয়েছে, তখন সংগৃহীত হয়ে, সর্বত্র না হলেও, স্থানে স্থানে উহার আলোচনা নিশ্চয়ই ছিল। কেন না আজও জিনিষটা রয়েছে। ভাগবতকে কেউ বলেন---উহা পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ, পুরাণ নহে; কেউ আবার দেবীভাগবতকেই প্রাচীন বলে দাবী করছেন। ভাগবতের পক্ষের লোক বলে যাঁরা পরিচয় দেন, তাঁরা আবার ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য করে ফেলতে চান। শ্রোতার রুচির অনুকূলে বিমর্দিত হয়ে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা কখনও ভাগবতের সেবক হতে পারেন না।

২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা যাঁরা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ---কর্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত, ভাগবত তাঁদেরই আরাধ্য, তাঁরাই

ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জন, পুণ্যসংগ্রহ বা দুঃখ-নিবৃত্তির দাওয়াইখানা মাত্রে পর্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃখ জানলেন, তাঁর পরম প্রিয় সনাতন, রূপ, জীবগোস্বামিগণ যখন জগতের দুঃখে দুঃখিত হলেন, তখন তাঁরা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করতে বাধা দিলেন। ভাগবতকে কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবী, ভর্তৃহরী প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা পুরাণগ্রন্থের অন্যতমরূপে, অথবা তাঁর (ভাগবতের) আলোচনাকে কালাপহারিণী ব্যবস্থাবিশেষে নিযুক্ত হতে দিলেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব জয়দেবের মধুর কোমল কান্তপদাবলীর আদর করলেন। জয়দেব মহাত্মার অষ্টপদী গীতগোবিন্দ উৎকলদেশে বেশ প্রচার আছে। দক্ষিণদেশে কম, পশ্চিমে নেই বললেও হয়, বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত। জয়দেব ভাগবতের কথা—তৃতীয় বৈঠকের কথা যাতে লিখিত আছে, তা অবলম্বন করে পরিশিষ্ট কথাবর্ণন করেছেন। অনেকে জয়দেবের কথা বুঝতে না পেরে তাঁকে আদর করতে পারেন নি।

দক্ষিণদেশের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর ধার হতে মহাপ্রভু 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' বলে একখানি পরমোপাদেয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনেন। এদেশে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দ-রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকাদি ছিল।

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দসনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনে পরম আনন্দে।।"

(চৈঃ চঃ ম ২।৭৭)

এই পাঁচ প্রকার গ্রন্থ ও গীতি গৌরসুন্দরের পরম প্রীতি বিধান করেছেন। এইত ভাগবতসম্প্রদায়ের অবস্থা। সাধারণ লোকে অর্থোপার্জন, পুণ্যসঞ্চয়াদির জন্য ভাগবত পড়ে ভাগবতপাঠকে মার্কণ্ডেয় সপ্তশতী পাঠেরই অন্যতম মনে করে।

আপনারা বোধ হয় কুলীনগ্রামীর মালাধর বসু—গুণরাজ খানের নাম শুনে থাকবেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের কথাগুলি বাংলা পয়ার ছন্দে পাঁচালী আকারে গ্রথিত করেছেন। গ্রন্থখানির নাম "শ্রীকৃষ্ণবিজয়"। সেই গ্রন্থে উজ্জ্বল-ভাবে লিখিত আছে—

"নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"

মহাপ্রভু এই কথায় পরম প্রীতিলাভ করে বলেছিলেন, "এই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত"।

হরিলীলা-শিখরিণী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচিন টীকা আছে, শ্রীমধ্বের নিজলিখিত টীকা আছে, মধ্বসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮।১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দুজন ভাগবতের ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীরা কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নি। তাঁরা কেবল কপটতার দ্বারা বলে বেড়ান ভাগবতে কেবলা-দ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত ভাগবতের কোথায়ও কেবলাদ্বৈতবাদ দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করে, এরূপ ধরণের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখবে বা জানবে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী নাকি একজন ভাগবতের পক্ষের লোক বলে অনেকে বলেন, কিন্তু তা নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অঘবকপূতনাও কৃষ্ণের লোক বলে পরিচয় দিয়েছিল। কৃষ্ণ মাথুরমণ্ডলে অঘবকাদি ১৮টি অসুর নিধন করেন এবং দ্বারকায় বাসকালে জরাসন্ধাদি আর ১৮টি অসুর ধ্বংস করেছিলেন। অসুরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণ তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়িতী আখড়ার লোক তাদের প্রধান পূজ্য বস্তু বলে নানা টীকা টিপ্পনী রচনা করে বৈষ্ণবধর্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ করছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার করতে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার করেছে।

যখন জগতে এই রকম ধরণের অন্যায় বিচার প্রবর্তিত হয়েছিল, এমন সময় চৈতন্যদেব মনুষ্যের কল্যাণের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্ম কি বস্তু, তাহা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের এমনই পোড়াকপাল যে, সেই কৃষ্ণকথায় রুচি নেই।

যেমন শ্রীচৈতন্য ভাগবত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এদেশের অবস্থার কথা বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন---লোকে কেবল গঙ্গাস্নানের সময় এক আধবার হরিনাম উচ্চারণ করত, ব্যবহাররসে মত্ত থাকত, পণ্ডিতেরা বাদবিতণ্ডা নিয়ে প্রবৃত্ত থাকতেন, ব্রাহ্মণেরা মরণের সময় 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' উচ্চারণ করতেন অর্থাৎ অন্তে নির্বিশেষগতি ছাড়া আর কিছু নেই, এই তাঁদের ধারণা, ভুলেও মহামন্ত্র উচ্চারণ করতেন না। ভাগবতের কথাকে লোকচক্ষু হতে আবৃত করবার জন্য এইসব কথা প্রবলভাবে চলেছিল। চেতনের বিলাসকে জড়বিলাসে পরিণত করে যাঁরা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁরা যাতে ঐপ্রকার দুশ্চেষ্টা হতে নিবৃত্ত হন, ভাগবতকে কদর্থিত করতে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁদের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা করেছেন। শেক্সপীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড়কবির পার্থিব জড়রসের কাব্যসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেলা করা, তাঁকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করার দুর্বুদ্ধি অত্যন্ত অপরাধের কার্য। কতকগুলি লোক আবার চৈতন্যদেবের অনুগত বলে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁদের নিকট হতে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা, উজ্জ্বল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়েছে। পাঁচের অল্পসঙ্গ হতেই যাতে জীব শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করতে পারেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অভ্যুদয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিশ্রম্ভভাব---পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন, শ্রীরূপ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত, শ্রীসনাতন বৃহদ্ ভাগবতামৃত, শ্রীজীব সন্দর্ভ ছয়টি, শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর সারার্থ দর্শিনী টীকা, শ্রীবলদেবও দশমের টীকা করেছেন। এইগুলি পরবর্তিসময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ে আলোচিত হচ্ছে। শ্রীবল্লভের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজের টীকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের আরও ২।৩ টি ভাগবত-টীকা আছে। এঁরা অবশ্য চৈতন্যের অনুগত নন। চৈতন্যের অনুগত যাঁরা, তাঁরা একভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আর চৈতন্যের কথা শ্রবণ করেন নি যাঁরা, যেমন বাদিরাজ প্রভৃতি তাঁদের ব্যাখ্যাধারা অন্যপ্রকার। যাহোক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রন্থই আলোচ্য। হেমসিংহসমন্বিত আসনে শ্রীমদ্ভাগবত সংরক্ষণপূর্বক প্রৌষ্ঠপদীতে শ্রীমদ্ভাগবত-বিতরণের মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে কীর্তিত আছে।

শ্রীজীব গ্রন্থ রচনা করে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য, ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ প্রচারে প্রচুর যত্ন করেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ কর্মজড়স্মার্তের বিরুদ্ধাচারকে বৈষ্ণবাচার বলে চালাচ্ছেন ও কলুষিত করবার অনেক যত্ন করেছেন। বাঙ্গালাদেশে প্রাকৃত সহজিয়ার প্রবল দৌরাত্ম্য চলেছে, ভাগবতবিরোধী কথা চৈতন্যদেবের অনুগত পরিচয়ে খাপিয়ে দিচ্ছে। লোককে খোসামোদ করার জন্য ভাগবতবিরোধী উল্টাকথা চালান কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য, তা ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা বলছি---ভারতে, কেবল ভারত নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হোক, অন্য সব কথা থেমে যাক। ভাগবতের কথাই চৈতনদেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নেই। চৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হলে লোকের নিত্য মঙ্গল লাভ হবে, অনন্তকালসঞ্চিত---জন্ম-জন্মান্তরের সকল অনর্থ---সকল অসুবিধা দূর হবে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী---শ্রীমদ্ভাগবত---কথাই গৌড়ীয়মঠের প্রচার্য বিষয়।

আমি এখন সংক্ষেপে আমার আলোচ্য বিষয়গুলি বলি ঃ ---

পাঁচের অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতকথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। অমলজ্ঞানের কথা গতকল্য বলা হয়েছে। সমলজ্ঞানে ভাগবতকথা আলোচনা হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা নেই, তাঁদের কাছেই ভাগবত আলোচ্য। আজ শ্রীচৈতন্যের অনুগত দাস পরিচয়ে কি অন্যায় কার্যই না চলছে। ওরা জগতের কোন মঙ্গলই করতে পারে না। গোপীবসনহর রাসলীলার নায়কের কথা কিভাবে বুদ্ধিমান নামধারিগণের দ্বারাও কদর্থিত হচ্ছে---তাঁরা উহার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন করে কিরূপ অন্যায় করছেন, মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ করে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন, তা বলে-শেষ করা যায় না। আমাদের বন্ধুবান্ধব আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা করে, নানা অশ্রাব্য কথা আলোচনা ও অদর্শনীয় চিত্র অঙ্কিত করে নিজেরা ত' খারাপ হচ্ছেনই, পরন্তু কত লোকের কপাল খারাপ করছেন। জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি, যা মহাপ্রভু তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে পরমপ্রীতির সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তার

নানা প্রকার কদর্থ করে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু করে ফেলেছে। কি দুর্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ করবার পূর্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এ সব কথা শোভা পায় না। তাঁরা এ সব আলোচনা করবার দাম্ভিকতা করতে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের সর্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা শুনবে? যাতে আপাত আনন্দ--ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুনবার জন্য ব্যস্ত। বিবর্তবাদীর কথা শোনাই মানুষ প্রয়োজন বলে মনে করে নিয়েছে। হরিকথা শোনবার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী, পরমসন্ন্যাসী "মহাব্রাহ্মণ" ও মায়াবাদী যারা, তারাই ভক্ত বা পাণ্ডিত্যটা তাঁদেরই মধ্যে আছে বলে লোক ঠকিয়ে লোকের অমঙ্গল করেন। যাঁদের কপাল খারাপ, তাঁরা তাঁদের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তারা অঘবকশাখায় উদ্ভুত, এদের সঙ্গ করে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল হবে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরসাশ্রিত সেবকধারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁরা পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। সম্মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণ রসায়ন কথায়ই মানুষের গ্রহণে যত্ন হোক।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।"

শ্রীকপিলদেব বলেছেন,—নির্মৎসরসাধুদিগের সর্বতোভাবে সঙ্গকারিজনগণ আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁরা তাঁদের বাক্যে শ্রদ্ধাবন্ত, তাঁরাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁরলীলা উপলব্ধি করতে সমর্থ। ভগবৎকথা নির্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ করে আনন্দবর্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃত-দ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হলে ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন হবার পর হরিনামরূপগুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাসজাত হয়। তৎপ্রভাবেই ভাবভক্তির নিদর্শন স্থায়িভাবরতিতে জীবের প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রীসহযোগে রসোদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

তৃতীয় দিবস

(তাং ৩১ শ্রাবণ, শুক্রবার; স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা)

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।"

প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকনিরূপণে বলেছি যে, বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাধর্মে যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের ভাগবতপাঠে অধিকার নেই এবং তদালোচনায় তাঁরা বেশী সুখ লাভ করেন না। চতুর্বর্গের সাধন-প্রয়াস--- উপাধিনাশ মাত্র। কিন্তু পঞ্চমবর্গের কথা আত্মার নিত্যধর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ভাগবতের মহিমা নানাস্থানে কথিত থাকলেও ইহা কতকগুলি ব্যক্তির রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি, ভাগবতের পাঠক এবং আলোচনাকারীদের মনস্তুষ্টির জন্য বিপরীত পথের পথিকগণও অনেকসময় ভাগবতের আদর করেন। কিন্তু তাঁদের ক্রিয়া কলাপে অনেক সময় ইহার সমধিক আদর প্রমাণিত হয় না। ভাগবতকে পুরাণ বা পঞ্চরাত্রান্তর্গত বলে অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আগম ও নিগম একত্রে মিলিত আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্তমান। আমরা ভাগবত আলোচনায় প্রথমস্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে 'সাত্বতী শ্রুতি' বলে একটী কথা পাচ্ছি। নারায়ণঋষি যখন নারদকে ভাগবত উপদেশ করেছেন, তখন উহাকে ' 'বেদসম্মিত' বলেছেন। যেমন শ্রৌতপদ্ধতি অবলম্বন করে বহু দেবতার স্তবকারী সাধারণ শাস্ত্রকেও বেদ বলেছে, সেইরূপ সাত্বতগণ ভাগবতকে বেদের সর্বোত্তম অংশ বলে বিচার করে থাকেন। প্রয়োজন---তত্ত্বনিরূপণে 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' শ্লোকে 'নিগম' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। তাছাড়া উপনিষদের অনেক মন্ত্র ভাগবতে যথাযথ প্রকটিত দেখতে পাওয়া যায়। ভাগবতের স্থানে স্থানে শ্রুতিবাক্য ন্যূনাধিক লিখিত হয়েছে--শ্রুতিতে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা---

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ।।"

গীতার বিশেষ অর্থ ভাগবতে দেখতে পাওয়া যায়—ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-স্বরূপ, বেদার্থপরিবৃংহিত এবং বেদমাতা গায়ত্রীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে ভগবত্তার কথা প্রচুরভাবে বলা হয়েছে এবং কৃষ্ণের অন্যান্য অবতারগুলির বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। সেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে লিখিত আছে। যেমন স্কন্দপুরাণ বিষ্ণুখণ্ডে চারিটি অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে, গরুড়পুরাণে এবং আরও কতিপয় পুরাণে ভাগবতের প্রাধান্য লিখিত হয়েছে। সর্বোপরি ভাগবতের অনুগসম্প্রদায় ইঁহাকে প্রমাণ শিরোমণি বলে থাকেন।

এই ভাগবত-ব্যাপারটী কি, এর এত প্রশংসা আছে কেন, আর এর প্রতি এত দৌরাত্ম্যই বা হয় কেন, এ বিষয়গুলি অবগত হওয়া দরকার। এটি কতকগুলি ব্যক্তির জীবিকার যন্ত্ররূপে পরিণত হয়েছে, পক্ষান্তরে পারমার্থিকের আদর্শ যাঁরা, তাঁদেরও ইহা পরম সেব্য। তদ্ব্যতীত সংসারে যাঁরা বাস করেন, বর্ণ ও আশ্রমচতুষ্টয় সকলেরই এই গ্রন্থ আরাধ্য। এমন কি জিনিষ ভাগবতে আছে, যা সকল শ্রেণীরই আরাধ্য। কতকগুলি কর্মের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা আছে—যেমন ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতিগণের ধর্মের বিষয় পৃথক-ভাবে লিখিত আছে। বর্ণবিচারে বিভিন্ন বর্ণাদির লক্ষণ এবং তত্তল্লক্ষণের দ্বারা বর্ণ নিরূপণের বিধান আছে। ভাগবতে দর্শনের কথা, জ্ঞানিগণের সকল শ্রেণীর কথাই আছে; সুতরাং ইহা সকলেরই পাঠ্য ও পরমপ্রয়োজনীয়। পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সংসারাসক্ত ও সংসারনির্মুক্ত—সকলেরই আলোচ্য। ইহা ভগবদভিন্ন বস্তু।

দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ বলে কথিত হয়েছে, কিন্তু এটি বিরাট রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা করলেই বুঝতে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন-দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না। অর্থাৎ চেতন-মিশ্র ভাব নিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সমলজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ

নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। করণের ভেদ জন্য এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি। যেমন,—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

যখন রামের সহিত কৃষ্ণ কংসসভায় প্রবেশ করেছেন, তখন তাঁকে বিভিন্ন রসের আস্বাদনকারীব্যক্তি বিভিন্নভাবে দর্শন করছেন। কিন্তু অমলজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিগণ সেরূপভাবে দর্শন করেন না। সাধারণ স্ত্রীগণ অর্থাৎ গোপীর অনুগত নহেন যাঁরা, তাঁরা যে দর্শন করেন, সেটা কতকটা কামনেত্রে দর্শন হচ্ছে। নিজেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট-দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থমণ্ডিত অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না। যাঁরা ব্যবকলন জানেন, তাঁরা পার্থক্য বুঝতে পারেন। ব্যক্তিবিশেষ ও পরমমুক্ত পুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে।

অনেকসময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? একথার উত্তর হচ্ছে—মলিনতার পরিমান অনুসারে। অনর্থ থাকা অবস্থা ও অনর্থাপগমের দর্শন পৃথক। ধনবস্তু হতে যদি ঋণযোগ্য বস্তুর পার্থক্য নিরূপিত হয়, তা হলে 'Differentia' বলে একটা বস্তু লক্ষিত হয়। ২৪ বৎসরের যুবার কাব্য অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির ভেদদর্শন হয় না; সে উভয়কে এক মনে করে; কিন্তু অভিজ্ঞব্যক্তি সেটা বুঝতে পারেন। অনেক সময় পার্থক্য-বোধের অভাবহেতু আমরা বস্তুনির্ণয়ে ভ্রান্ত হই। এসকল বিচার সম্বন্ধপর্য্যায়ের আলোচনা-কালে বিশেষভাবে বলা হবে। বিভিন্নস্তরের তর্কজ্ঞান-রহিত—সকলেই সর্বাবস্থায় আলোচনা করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজ নিজ কর্তব্য নিরূপিত হতে পারে, কোন প্রকার সংশয়-সমস্যা থাকে না। ভগবদ্দর্শনে সর্বসংশয় দূর হয়—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।।"

পূর্বেই বলেছি যে, ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু। তাঁর শ্রবণ, কীর্তন, বিচারণ প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জগতের বস্তুদর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তাহলে সেই বস্তুবিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনকালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে, আলোচিত হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছে, তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণীবিবাহ বা বৃন্দাবনীয় কথা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়, তাহলে তাঁর ভোগের ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য সমাবর্তনের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং দুয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝতে পারেন। কোন ব্যক্তির শ্রীপঞ্চমীতে হাতে খড়ি নিয়ে পাঠশালায় যাবার সময় যদি কৃষ্ণের সান্দীপনি-মুনিগৃহে গমনবিচার এসে যায় অথবা অর্জুন কিম্বা উদ্ধবের প্রতি ভগবানের উপদেশ-কথা যদি তাঁর স্মৃতি পথে উদিত হয়---কৃষ্ণের সংসারে বাস, কৃষ্ণ-কথালোচনায় নিযুক্ত থাকেন, অন্ততঃ গৌরসুন্দরের কৃত্যগুলির সঙ্গে নিজ-কার্যগুলি মিলিয়ে নেন, তাহলে সকল অসুবিধার হাত থেকে তার পরিত্রাণ হয়।

ভাগবত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ-দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হবার পরে আমরা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হতে পারি। প্রকৃষ্টরূপে মেপে নেওয়া ধর্ম যাতে, তাই প্রমাণ। ভাগবত নিত্যলীলাময় ভগবানের চরিত্রবর্ণনের প্রমাণ। ভাগবতের দ্বারা কি কার্য হয়? ইনি সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক---উভয়ই। যে ভয়ানক ব্যাধি বিজ্ঞ দার্শনিকগণের মধ্যে প্রবেশ করেছে---বেদান্তসূত্রের নির্বিশেষপর ব্যাখ্যা ইংরাজী ভাষায় যাকে Impersonalism বলে, উহাই সর্বাপেক্ষা ভীষণ ব্যাধি। ভগবত্তাকে নির্বিশেষরূপে স্থাপন করে নিজের জড়বিশেষের আস্ফালনে ব্যস্ত হওয়া প্রধান ব্যাধি। যেমন হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কংস জরাসন্ধ প্রভৃতির হয়েছিল। এই ব্যাধি চিন্তাশীল প্রাণীজগতের চরম মঙ্গলের প্রতি বাধাপ্রদর্শন জন্য সর্বাপেক্ষা Cogent Engine! ভাগবতধর্মটিকে ধ্বংস করার জন্য কিভাবেই না প্রয়াস করেছে! বর্তমান সময়ে ঈশবৈমুখ্যভাব---কারও আনুগত্য করব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হয়ে পড়েছে। ভাগবত কখনই বুঝতে পারা যাবে না, যদি বলা

যায়---এতে নির্বিশেষ-বিচার আছে। এই চরম ব্যাধির হস্ত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া দরকার। যেমন নামাপরাধকারীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধবিনাশের উপায়।

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ।।"

অপরাধের চরম সীমাই হচ্ছে---ভগবত্তাকে নির্বিশেষ বিচারে স্থাপন করা। মাপ্‌তে মাপ্‌তে Tabularasa পর্যন্ত পৌঁছায় অর্থাৎ জড়ের সব মলিনতা---খণ্ডজ্ঞানের সব অভিজ্ঞতা হতে মুক্ত হয়ে ত্রিপুটিবিনাশের অবস্থাই হচ্ছে সেই ভীষণ ব্যাধি। সেই ব্যাধি হতে মুক্ত হতে হলে ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা করতে হবে, ভাগবতবিরোধীর নিকট নয়। ২৪ ঘন্টা যাঁরা ভাগবতসেবা করেন, প্রত্যেক কার্যই যাঁদের ভগবৎসেবা, যাঁরা চেতনদর্শনে মেপে নেওয়া ধর্মকে নিযুক্ত করেছেন, অচিৎপিণ্ড-দর্শনে আবদ্ধ নন, এমন পূর্ণচেতন বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ---পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীন ভাগবতগণ, অচেতনের মলিনতা হতে যাঁরা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁরাই ভাগবত সুষ্ঠুভাবে উপদেশ করতে পারেন। যদি ভাগবতের মধ্যে আষাঢ়ে গল্প---Archacological research or chroniclers---ঐতিহ্যবিদগণের কোন কোন অংশ আছে, বিচার হলে ভাগবত অধ্যয়ন হল না। গৌরসুন্দর যে প্রণালীতে ভাগবত আলোচনা করতে বলেছেন, তদনুসারে আলোচনা না হলে আগাছা রেখে মূল গাছ উৎপাটন করে দেওয়া হবে। তজ্জন্য ২৪ ঘটন্তার মধ্যে যেন শ্রবণ-কীর্তন-বিচার হতে বিচ্ছিন্ন না হই। ভাগবতে এইরূপ প্রচুর কথা আছে---

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা।।"

রাত্রিকালনির্দ্রায়, প্রাপ্তকালে বয়োধর্মবশে ইন্দ্রিয়-তর্পণচেষ্টা কিরূপ অসুবিধা করায় তা সকলেই জানেন। কামুকতালাভের জন্য বানরের gland দ্বারা rejuvinated হবার চেষ্টা, মকরধ্বজ খেয়ে শরীর তাজা রাখার ব্যবস্থা, 'কলপ' ব্যবহারদ্বারা কৃষ্ণকেশ সংরক্ষণ, ভগ্নদন্তের পুনস্থাপনে বয়োধর্ম রক্ষা,

কার্যোপযোগী দর্শনের অভাবহেতু পরচক্ষুর্দ্বারা প্রয়োজন নির্বাহ করে স্বাস্থ্য-সংগ্রহের চেষ্টা করি। কিন্তু "আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ"। অত্যধিক সাধন করতে গেলে বিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাই বেশী হয়। গীতা বলেছেন, যাঁরা আত্মকর্ষণ করেন, তাঁরা তামসিক, নিজের গালে নিজে চড় মারবার চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও সুবিধা হয় না। আর যাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকেও তফাৎ থাকতে চান প্রতিষ্ঠার জন্য, তাতেও অনিত্যতা আছে। সমস্ত দিবাই অর্থের চেষ্টায় কাটছে, কিন্তু অধিক অর্থ থাকলে কি করে লোকরঞ্জন করব, প্রয়োজন হলে তাদের কাছে আবার ভিক্ষা পাওয়া যাবে, এসব চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি। অন্যের কুটুম্ব দুর্ভিক্ষে মারা যাক, কিন্তু আমার কুটুম্বের কিছু সেবা করে প্রতিষ্ঠা পাব। কৃষ্ণচেষ্টাব্যতীত অন্য চেষ্টা উদিত হলে অসুবিধা হবে। অতএব যেখানে যত চেষ্টা আছে, তা পরিত্যাগ করে পরম প্রয়োজনের জন্য যত্ন করা দরকার। তাকে বাদ দিয়ে যতরকম ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা সাত্ত্বিক শাস্ত্রকে **standard** মনে করি, সমস্ত বাদ দিয়ে রজস্তমোবিধানে কাজ চলুক, তাহলে রাজসিক তামসিক ব্যাপারে ইউরোপ আমেরিকার যে দুর্দশা এসেছে, সেইটা আমাদেরও আক্রমণ করবে। রজস্তমোগুণতাড়িত হয়ে সত্ত্বগুণকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তির ফল ভগবান পদে পদে দেখিয়ে দেন। যখন আমরা মৎস্যধর্ম নিয়ে বঁড়শীতে টোপ খাই, বঁড়শীর **angle** এ চামড়া বিঁধিয়ে নিয়ে মৎস্যভোজীরা আমাদের মাংস খায়, তখন বুঝতে পারি যে আমাদের বিনাশের জন্যই তারা এত দয়া করেছিল। ভাগবত ১১শ স্কন্ধ আলোচনা করলে জানা যায়, রজোগুণের দ্বারা তমোগুণকে বিনাশ করে সত্ত্বের দ্বারা রজের প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করতে হবে এবং বিশুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা মিশ্রসত্ত্বকেও নিরাস করতে হবে। রজোগুণের কার্য কি? আমি---বাহাদুর, **Red cross society**র **memeber**, দেশবিদেশের-**flood relief** করাই ত আমাদের ধর্ম! ওতে কি হয়? না, আমি অন্যের যে উপকার করেছি তদ্বিনিময়ে তারা আমার কামুকতার ইন্ধন সরবরাহ করুক। সত্ত্বগুণের দ্বারা ঐ প্রবৃত্তিটা থামিয়ে দিতে হবে। যদি রাজসিকগণ বলেন---বিষ্ণুভক্তিতে দেশ জাহান্নামে গেল, তাহলে তাদের তমোগুণটাই বৃদ্ধি হয়ে যাবে। ভাগবত যে উপকার করেছেন, তাঁর কার্য তাঁরা আলোচনা করেন না।

ভাগবত কি বিষয় আলোচনা করেছেন? কৃষ্ণের, রৌহিণেয় রামের, দাশরথি রামের, পরশুরামের, বামনের, বরাহদেবের, নৃসিংহদেবের, কূর্মদেবের, মৎস্য-দেবের, লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্রহ্ম, পরমাত্মার ব্যাপকতা ও শক্তির বিষয় আলোচনা করেছেন। সুতরাং নির্বিশেষব্যাধি নিরাস করে সবিশেষধর্মের পূর্ণতা স্থাপিত হয়েছে। এই ডাক্তারখানায়---যেখানে সকল ঔষধের ভাণ্ডার, চৈতন্য ও তদনুগগণের দ্বারা অকাতরে ঔষধ বিতরিত হচ্ছে। কিন্তু এমন দুর্ভাগ্য এই দেশের যেমন করে হোক ভাগবত এদেশ হতে চলে যায়, তজ্জন্য উঠে পড়ে লাগাই প্রধান কর্তব্য হয়ে পড়েছে। ভাগবতের ছিদ্র অন্বেষণ করে কর্মপ্রবৃত্তিকে বন্ধন করা হচ্ছে। কিন্তু নশ্বরতা বিশ্বদর্শনের অঙ্গ জেনে---

"কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

---শ্লোকের আলোচনারহিত হলেই আমাদের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। ভাগবত (৪।২২।৩৯) আর একটী কথা বলেছেন---

"যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়োঽপি রুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।"

একমাত্র শরণ্য বাসুদেবের পাদপদ্মাঙ্ঘ্রিবিলাসগতলীলারূপ ভগবদ্ভক্তি-যাজন-ক্রমে সাধুগণ বদ্ধভোগীজীবের কর্মাগ্রহিতা যেরূপ উন্মুলিত করেন, পূর্বসঞ্চিত কর্মবীজদূরীকরণ-কার্যশূন্যবিচার-রত সংযমনপটু যতিগণের অনুষ্ঠান দ্বারা সেরূপ সিদ্ধ হয় না। অতএব সেই বাসুদেবের সেবা করাই বিহিত।

বাসুদেবের কথা সকলেই জানেন। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং 'বসুদেব' শব্দিতং।" যে বাসুদেব বিশুদ্ধসত্ত্ব, অন্যের ন্যায় রজোগুণে যাঁর সৃষ্টি হয় নি, তমোগুণে যাঁর বিনাশ হবে না, সেই অধোক্ষজতত্ত্বকে আমি ভজন করি। 'অরণ' শব্দে শরণ্য। একমাত্র বাসুদেবের শরণ নিতে হবে। রজোগুণ বা জড়সত্ত্ব সংরক্ষণ করতে

হবে না, কিন্তু যে সত্ত্ব কালের দ্বারা বিনষ্ট হবে না, সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে বাসুদেবের জন্ম। তিনি পুরুষোত্তম বস্তু, ত্রিগুণকে বিতাড়িত করেছেন, তাঁর শরণ নিতে হবে। 'রিক্তমতি' মানে vacant---সব ছেড়ে দিয়ে Tabularasa অর্থাৎ নির্বিশেষ করে দাও---এরূপ বুদ্ধি নেই যাঁদের, তাঁরা ভজন করছেন। 'নিরুদ্ধশ্রোতোগণাঃ'--- স্রোতসকল নিরুদ্ধ করার চেষ্টা---ইন্দ্রিয়বেগ সংযত করার চেষ্টায় যাঁরা আছেন, তাঁরা সুবিধা পান না। অত্যন্ত অসংযত ব্যক্তিও ভগবৎসেবা করলে সুবিধা হয়ে যায়।

"যৎপাদপঙ্কজ .... সন্তঃ" অর্থাৎ ভগবানের পাদপদ্মের অঙ্গুলি-সকলের কান্তি স্মরণ করতে করতে ভক্তগণ পূর্বসঞ্চিত কর্মবাসনাময় হৃদয়গ্রন্থিকে অনায়াসে ছেদন করেন। 'পলাশ' অঙ্গুলি, তাতে যে বিচিত্রতা অর্থাৎ বিলাসের যে সেবা-সাহচর্য্য; যেমন বজ্রাঙ্গজী রাঘবেন্দ্রের সীতা-বিযুক্তিকালে যে সাহচর্য্য করেছিলেন। ইহা ভগবানের বিলাস, ভক্তের পক্ষে সেবা। মানুষ কর্মাশ্রয়ে গ্রথিত হয়ে যাচ্ছে---আমার কর্মফল আমি ভোগ করব---এ রকম দুর্বুদ্ধি করছে---যেমন গ্রীসদেশে virtue & piety সংগ্রহ করার নামই ধর্ম। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় বলেছেন---

পুণ্য সে সুখের ধাম তার না লইও নাম,
পাপ-পুণ্য---দুই পরিহর।

মুণ্ডকও বলেন---

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

পাপিষ্ঠগণ পুণ্যসংগ্রহে ব্যস্ত। Altruistic Propaganda- কারীর কার্যই হচ্ছে---তারা বা তৎকল্প বন্ধুবর্গ যে-সব অন্যায় কার্য করেছে, তাকে whitewash করার চেষ্টা। উহা নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির জন্য। কর্মাশয়---স্বর্গাদিতে বাস-চেষ্টা, তাতে মানুষ কিছু শান্তিলাভ করতে পারে, কিন্তু সেটা টেঁকে না। দুই আশা ভরসা যাঁরা ত্যাগ করেন, তাঁরা নির্বিশেষজ্ঞানী বা Gnostic---Impersonal aspect of Godheadকে লক্ষ্য করেন। সেই বিষম

ব্যাধির চিকিৎসক হচ্ছেন ভাগবত। ভাগবত বাসুদেবের ভজনার্থ উপদেশ দিয়েছেন, উহা Phytographic, zoo morphic or anthropomorphic demonstration নয়। আমরা সময়ান্তরে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করবো। তাহলে ভবরোগি-সম্প্রদায়ের বিষম রোগ নির্বিশেষপর বেদান্তবিচারের নামে রজস্তমঃপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি করা বা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের নামে দরিদ্রকে নারায়ণ বলে দাতা হয়ে জন্মান্তরে প্রশংসা বা সেবা নেবার চেষ্টা---এর মূল্য কানাকড়ির চেয়েও কম বলে বোধ হবে। এই কথাটা বিভিন্ন দেশে বহুমানিত হচ্ছে ভাগবত আলোচনার অভাবে। তারা বলছে---ধর্মকে সোজা কথায় altruism বলা যায় অর্থাৎ সত্ত্বের পরিচয়ে তাহার অংশীদার---রজস্তমোগুণচালিত হয়ে সংসারে বাস করা। পূর্বেও কিছু ছিল না, পরে থাকবে না, জড়মিশ্রণে চেতন হয়েছে, redistributed হয়ে যাবে ইত্যাদি বিচার রোগজাতীয়। ধর্মজগতে যত রোগ হয়েছে, এ সকলেরই চিকিৎসাপ্রণালী ভাগবতে আছে। ভাগবত সব রোগ বিনাশ করে রোগের মূল আকর পর্যন্ত উপড়ে দেবেন ---Antitheistic চিন্তাস্রোতকে থুৎকারে উড়িয়ে দেবেন যদি মানুষের শ্রবণের কান হয়। যদি empericism এর কান হয়, তবে বহির্জগতের চিন্তাস্রোত আমাদিগকে আক্রমণ করবে। সেটা dismantle করবার ব্যবস্থা শ্রীমদ্ভাগবত করেছেন।

কতকগুলি লোক বলেন,---"ভাগবতে দুর্নৈতিক-কথাপূর্ণ কৃষ্ণলীলা আলোচিত হয়েছে; সুতরাং ভাগবতের বিচারপ্রণালী ব্যভিচারকে পুষ্টিসাধন করবার জন্য!!" কিন্তু আমরা বলি,---এটা allegory বা history নয়। এতে কি কি সমতা ও বৈষম্য আছে, সেটা বুঝবার জন্য খানিকটা সময় দিতে হবে।

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।"

—এই বিচার গ্রহণ করলে ভাগবত কি, সেটা আমরা জানতে পারবো। চতুর্বর্গপ্রয়াসী চিন্তাশীল, নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনপ্রয়াসী—প্রত্যেককে বলা হচ্ছে, যদি বাস্তবসুখ চাও, বাস্তবসুখের একমাত্র কর্তা কৃষ্ণকে ছেড়ে সুখ পাবে কোথায়?

চতুর্থ দিবস

(সোমবার, ১৯শে আগষ্ট)

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ।।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারানুমোদিত ভাগবতের যে ব্যাখ্যা, তাই আমাদের অবলম্বনীয়। যে কৃষ্ণচৈতন্যদেব পূর্বে যাহা কোন দিন জীবকে দান করেন নি, সেই স্বভক্তিশোভা কৃপাপরবশ হয়ে জীবগণের সুপ্রাপ্য করেছেন, সেই সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদের হৃদয়ে সেই সকল ভক্তির কথা—যাহা ভাগবতের মধ্যে উল্লিখিত আছে, বিস্তার করুন।

আমরা তৃতীয় দিবস যে ভাগবতের কথা বলেছিলাম, তার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ভগবদ্‌বস্তু কখনই নির্বিশেষ শব্দবাচ্য হয়ে স্তব্ধীভূত হতে পারেন না, তিনি অধোক্ষজবস্তু, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। বদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ—সেবকজাতীয়। কিন্তু সেব্যজাতীয়, পূজ্য না হওয়ায় সেইসকল বস্তুদ্বারা তাঁর স্মৃতির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা ভোগ্যবিচারে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে গ্রহণ করি, তা কখনই সেব্য হতে পারে না। এজন্য ভগবদ্‌বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হয়েছে অর্থাৎ যেবস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের—বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে সর্বক্ষণ অবস্থিত রাখতে পারেন, তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, অধিরোহপন্থীদের প্রাপ্য বস্তু নহেন। তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্‌গোচর হন। এজন্য শ্রুতি বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।।"

ভগবানের তনু কেহ এই চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। এই প্রকার চক্ষুদ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বিধায় তাঁকে দেখা যায় না। এই কর্ণদ্বারা তাঁর কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁর নির্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁর উচ্ছিষ্ট আস্বাদন করতে পারা যায় না, এই মনে তাঁর চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁকে সর্বকাল সর্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তি-পরিচালন-যোগ্য ভূমিকা হতে পৃথক না রাখতেন, তবে বাহ্য ভোগ্য-বস্তুরই অন্যতম হতেন। তাহলে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁর আশ্রয় নিতে হবে—এসকল কথা মনোমধ্যে উদিত হত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার ব্যাপারবিশেষ নন। এখানে কথা হতে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত তাঁকে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা, তাই অপরোক্ষ। তাঁতে একত্বের সমাধান আছে, কিন্তু বহুত্ব নেই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ করে—সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—দ্রষ্টৃসূত্রে সেই বস্তুকে ভোগ করি—তাঁকে দৃশ্যমাত্র জ্ঞান করি, শ্রীমূর্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁকে দেখতে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অক্ষজজ্ঞানপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই দ্রষ্টব্য। ভগবদ্‌বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁর দেখার উপযোগী হয়ে যেতে পারি, তবেই তাঁরদর্শন সম্ভব হতে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধক্ষালনের জন্য, ভবরোগের ঔষধ জ্ঞান করে দর্শন করতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হয়ে দর্শন না করতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতা পরিমার্জিত কি করে হয়? চৈতন্যদেবের ভাগবতের আহৃত তত্ত্ব থেকে একটী শ্লোক এই রকম দেখতে পাই,—

> "চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
> শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
> আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
> সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্।।"

তিনি উপদেশক জগদ্‌গুরুসূত্রে মলিন-হৃদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন সর্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্তন অর্থে—যাঁর বর্ণনে জীবের বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্তিত হন, তবেই শ্রবণ করতে পারি। কিন্তু বর্তমানে আমরা এমনই সেবাবিমুখবুদ্ধিতে বাস করি যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হলে কীর্তন শুনতে প্রস্তুত নই। এজন্য তৌর্যত্রিকগণের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হবে বলে গীতিমুখে কীর্তনের ব্যবস্থা। যারা গীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তাদের জন্য বিভিন্ন Decoration দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত করে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্তন করি। যদি তারা আগে থাকতেই ঠিক করে রাখে—কৃষ্ণকথা শুনবো না, শুনলে আমাদের ভোগবুদ্ধি হ্রসিত হবে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুনতে উৎকর্ণ আছি, প্রভুসজ্জায় সজ্জিত হয়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি, তাদের মঙ্গলার্থই হরিকীর্তন। যেমন গরু খড় না খেতে চাইলে খইল নুন মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। তাহলে গান-শোনা প্রবৃত্তি থেকে কিছু রাইকানুর গান শুনতে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ করবার জন্য কীর্তন।

কেউ কেউ বলতে পারেন,কৃষ্ণ একটী দুর্নৈতিক, ঐতিহাসিক নায়ক, তাঁর কথা শুনে কি হবে, তা ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুনবো। সেরূপ বিভিন্ন ধর্মে অবস্থিত থাকলে যাবতীয় মলিনতা দূর করবার জন্য কৃষ্ণকীর্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্তবৃত্তি স্তব্ধ হয়, সেইপ্রকার গীত- যোগে হরিকথা কীর্তিত হলে কাব্য-রসামোদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্তনে আকৃষ্ট হয়।

সম্যক্ কীর্তন বললে নীরস, বিরস, রসরহিত পথের পথিক যারা, তাদের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি, বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হলেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করবে (যদহরেব বিরজ্যেত, তদহরেব প্রব্রজেৎ), তারও মূল্য সংকীর্তনের নিকট তুচ্ছ। জড়ের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্ বিপরীত ভাবটি বিরাগ, উহা বিলাসরহিত। জড়েন্দ্রিয় বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দবর্ধন হবে জেনে আমরা

বিলাসে ধাবমান হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্তি-ফল ক্লেশের ভূমিকা বলে যখন আমরা বুঝতে পারি, তখন বিলাসকে স্তব্ধ বা সংযত করে থাকি, উহাই বিরাগ।

শ্রেয়ের বিচার করলে জড়বিলাস—প্রেয়ের প্রতি আমাদের যে রোচমানা প্রবৃত্তি, তা হতে নিবৃত্ত হতে হয় কিন্তু মৎস্যধর্মের বশীভূত হয়ে ভোগরূপ টোপ খেলে আনন্দ হবে মনে করে বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে যাই। ইন্দ্রিয়ের বিলাস করতে যেয়ে এই অসুবিধা পেলে তখন বিরাগ-শাস্ত্র আলোচনা করি—উপনিষৎ, দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনা করে মুক্তিলাভের বিচার-বিশিষ্ট হই—আপাত-প্রেয়ঃ কাব্যরসামোদ হতে বিরত হয়ে একটা অবস্থা পাব মনে করি। উপনিষদ্ পাঠ করলে জড়বিলাস ত্যাগ করে জড়বিরাগের উৎকর্ষ ধর্মে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি—ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হলে আত্মহত্যা হয়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন,—

"ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ"

উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় বলে কি আসক্ত হয়ে যাব? এর একটি সুষ্ঠুবিচার বলেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি করতে হবে; সেই ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সংকীর্তন। 'কাঁহার কীর্তন' বলতে গিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব বললেন —শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন। সকলে মিলে যে কীর্তন, উহাই সংকীর্তন—'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্তনং তদেব সংকীর্তনম্।' কেউ যদি বলে,নির্জনে বসে ধ্যান করবো, কিন্তু তাতে বহু বিরুদ্ধধর্ম বর্তমান। গমনের ভিন্ন ভিন্ন সরণি আছে, কোনটী গ্রহণ করব জানি না। যখন আমরা ধ্যান করবার জন্য কপাট বন্ধ করে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তিসকল আমাদিগকে টেনে নেয় পূর্বসঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ করে আমাদের সর্বনাশ করে। যেমন এই স্থানটী (শ্রবণসদনের প্রতি লক্ষ্য করে) 'সদন' শব্দবাচ্য, ইহা একটি গিরি-গহ্বর বা ভোগের আগার নয়। এখানে আমরা বহু লোক একত্র হয়ে কীর্তন করতে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্ত বৃত্তি, তাতে যে অভাব আছে, সেটা পূর্ণ হতে পারে—সংকীর্তনে। যখন সকলে এক তাৎপর্য্যপর হয়ে প্রপূজ্য বস্তুর কীর্তন-মুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন

প্রত্যেকেরই হৃদ্‌গতভাব এই যে, কাকে ডাকছি, কিজন্য ডাকছি এবং এর ফল কি? ধ্যানাদিতে পরের সাহায্য পাই না। বধির না হলে—হরিকথা শুনবার কান থাকলে আমরা জানতে পারি—সম্যক্ কীর্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠকথা, গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে।

কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁর কীর্তনই সম্যক্-কীর্তন। নৃসিংহলীলার কীর্তন করলে—ভক্তবৎসল, ভক্তবিঘ্নবিনাশন ভগবানের করুণ, বৎসললীলার কীর্তন করলে বল, দৃঢ়তা লাভ করতে পারি; কিন্তু তাতে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্তন হয় না—ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে যত্নের ত্রুটী থাকে। যদি জানতে চাই, নৃসিংহদেব কার অবতার? কেউ বলতে পারেন—নির্বিশেষব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। জয়দেব বলেছেন—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তেদশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।

এইটিই ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়। এঁরা কৃষ্ণেরই অবতার—তাঁর অংশকলা হতে জাত। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় ভগবান বলেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শান্ত দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা করতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ভেদে নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্তরসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-বজ্রাঙ্গজী রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জুন, বাৎসল্য-রসে বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হয়েছে, সে সকল স্বয়ংরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ করেছে। কিন্তু তাতে পূর্ণতমতার অভাব আছে। এই জন্যই ভাগবত বলেছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্জুনের কৃষ্ণসান্নিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদাম-সুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁরা, কান্তাগণ, পিতৃ-

মাতৃবর্গ, চিত্রকপত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁরা সিংহাসন, ব্যজন, পাঁচনবাড়ি যে প্রকার সেবা করেন, সেই সকল 'সেবাধর্মে যে কীর্তন আছে, সব একত্রিত হলে সম্যক কীর্তন হয়। পঞ্চরসরসিক একত্র হলে সম্যক্ কীর্তন হয়। কেনা টিকিটের শেষগতি পর্যন্ত না গেলে তা হতে দূরের কথা জানতে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হয়ে বাস করছি, রসকে generate (রসোৎপত্তি) করছি; কিন্তু তাতে কৃষ্ণ নেই। কৃষ্ণে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই—রসগ্রহণের ভাণ্ডার অন্য জিনিষে পূর্ণ না করি—সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরস পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করতে পারব। চৈতন্যদেব বলেছেন, —চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, সাংসারিক বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্তনের দ্বারা। অখিলরসামৃতমূর্তি-কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ দ্বারাই সম্যক্ কীর্তন হবে, অন্য অবতারের কথা শুনলে হবে না। লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্তন অপেক্ষা—-রামের কীর্তন অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্তন, মথুরেশ অপেক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্তনই সর্বতোভাবে জয়যুক্ত। কৃষ্ণকীর্তন হলেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকে অবসর প্রাপ্তি হয়। দশমস্কন্ধে কৃষ্ণসঙ্কীর্তন পূর্ণমাত্রায় আছে, তাহলে দশমটি লিখলেই হত, অন্যান্য স্কন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য নির্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ রাম-রাম-রাম সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হয়েছে। রোহিণেয় রামের রাস পর্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসোনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।।

রসবিচারে কৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ দেখান হয়েছে। কাব্যশাস্ত্র আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বর্ণিত হয়েছিল। তাতে 'উরুক্রম'—'উপক্রম' বা 'ত্রিবিক্রম' শব্দে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির রাজ্যে যাঁর পাদপদ্ম পূজিত—"ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" তিনি কাষ্ঠের মৃগের ন্যায় অচেতনের মত বসে না থেকে তিনটি পা ফেলেছিলেন। 'নিদধে'—লিটের পদ। লীলাময় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নির্বিশেষ করতে পারে না।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।

[ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হয়েও অমিত-বিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা করে থাকেন। কেন না শ্রীহরি এতাদৃশ গুণ সম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে থাকেন।]

সেই উরুক্রমের চরণ-প্রাপ্তির উপায় কি? তৎ-প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্।।
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।

কপাল-পোড়া 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' জীব আমরা, উরুদাম শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্ঠে মায়িকরাজ্যে আমাদিগকে মায়া বেঁধে রেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হবে, তদুত্তরে বলেছেন—নৈষাং মতিস্তাবৎ ইত্যাদি।এখানে একটি ভাল কথা বলেছেন—"নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ"। যাঁরা জগতে কিছু আছে মনে করে দৌড়াচ্ছেন, তাঁদের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁরা ইহজগতের কিছু দান করতে আসেন না, সেই জগতের জিনিষ, যা' ইহজগতে নেই, তাই দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। তাঁদের পায়ের ধূলিতে যে মুকুট প্রস্তুত হবে, তা পরবার জন্য যাঁদের আকাঙ্ক্ষা, তাঁরা উরুক্রমাঙ্ঘ্রিস্পর্শাধিকার পাবেন। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি, যাঁর কথা গৌরসুন্দর চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করলেন, সেই উরুক্রমে অঙ্ঘ্রি যে-কালপর্যন্ত স্পর্শ করবার যোগ্যতা না হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হবে না—**Impersonalism** থামবে না। চেতনময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চলে বেড়ান, সেই পায়ের আঙ্গুল-স্পর্শযোগ্যতা না হলে তাপত্রয়ের উন্মূল

হবে না। বদ্ধজীব আমরা যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা-বিশিষ্ট হই, সেটা "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্"—উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি লাভই প্রকৃত মোক্ষ। ভাগ্যহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ করে নরকের পথে—জড়-বিলাসের পথে অগ্রসর হচ্ছে, চেতনময় কৃষ্ণবিলাসে যোগদানের যে বৃত্তি, সেইটিই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-লাভ। যে পাদ্মপদ্ম ত্রিজগদ্ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি জানি।
তাহে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ করে যখনই অবাস্তব দর্শন হচ্ছে, তখনই ভোগ-বিলাসিতা বৃদ্ধি হচ্ছে—প্রভুত্ব করার যত্ন হচ্ছে, সেব্যভাব গ্রহণ করে তাঁকে সেবক বিচার করে বসছি। 'তিনি আমাদের সেবক, আমাদের ভক্ত'—এ দুর্বুদ্ধি হলে অসুবিধা, তাঁর ভক্ত হলে সকল সুবিধা। তিনি বলছেন—তোমার সর্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে সুখ আস্বাদন করাও, তা হলে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করাব। আর যাঁরা কলা দেখাবেন, **Impersonal** (নির্বিশেষ) হবেন, তাঁর শিরশ্ছেদ হস্তপদাদি খণ্ড খণ্ড করে অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেবেন—চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেলবেন, তাঁরাই সর্বাপেক্ষা পরম শত্রু। তাঁদের পরিণাম—"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"। তা থেকে আরও অধিক শত্রু—যারা বিচার করছেন, নাভিদেশ হতে মস্তক পর্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গগুলি অন্যসেবার জন্য থাকুক। তারা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' বিচারে রাধাগোবিন্দের লীলাকে আক্রমণ করছেন। তাদের এই নির্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা দূর হলে ভক্তিসদাচার জানবেন—রূপ-সনাতনের কথা জানতে পারবেন। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহু মতবাদের লোক তাঁকে আক্রমণ করেছিল। শ্রীসম্প্রদায়, বৈষ্ণব নামধারী মধ্ব-সম্প্রদায় কত না বাগাড়ম্বর করে অপরাধ করেছিলেন।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্।।

[বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধ মতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্য-বাসী মনুষ্যদিগকে কৃপা-চক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করে বৈষ্ণব করেছিলেন।]

পরমকরুণাময় শ্রীচৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁরা "যে তিমিরে সে তিমিরে।" আবার প্রচারের আবশ্যক। সেগুলি পুনরুজ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্যদেব কি বলেছিলেন, তারা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তারা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী—**rational** বুদ্ধিমান, বাঙ্গালীদের মত **emotional** নই। কিন্তু রাধাগোবিন্দের কথা তাদের মধ্যে একেবারে নেই। রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে রাধাগোবিন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার সময় অনেক লোকে বাধা দিয়েছিল। তারা বলে, চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পরিবর্তে এ মূর্তি কেন? কিন্তু আজ দু'তিন বৎসর হল সেখানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মূর্তি পূজিত হচ্ছেন। যেখানে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাগোবিন্দের কথা আলোচনা করেছিলেন, সেখানেই রাধাগোবিন্দ বসেছেন। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তর-ভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্গোস্বামি-প্রকটিত সেবা-সৌখ্যদর্শনের যোগ্যতা তাদের হচ্ছে না, ইহা তাদের বড়ই দুর্ভাগ্য। সুব্বারাও নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অনুবাদ করেছেন। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁদের শুনা হয় নি, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁদের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌছায় নি, তাঁরা ভাগবতের আলোচনাই বুঝবেন না; যারা এ পথের পথিক নয়, তাদের দ্বারা ভাগবতের অনুবাদ হয় না।

ভাগ্যহীন পশ্চিমদেশীয় লোকগণও নানা প্রশ্ন করে; গতকল্য মথুরার একজন পণ্ডিতও প্রশ্ন করেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নেই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি—কার জন্য থাকবে, বুদ্ধিকম লোকের জন্য থাকবে? মহাপ্রভু 'গোপী' 'গোপী' জপ করেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হলে।

কার নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কারও নাম নেই বলে তাঁরা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় পূর্ণাধিকার লাভ করেন নি? চন্দ্রার নামও ত' নেই? কার জন্য থাকবে? আমাদের মত নির্বোধের জন্য? নাম নিয়েই বা তারা

কি করছে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাসশুকাদি ঐ নাম গোপন করেছেন।যাঁদের যোগ্যতা হবে, তাঁরা যত্ন করলে দেখতে পাবেন।

তা' হলে আমরা আলোচনা করলাম—ভাগবতের অধোক্ষজ আর উরুক্রমের কথা। উহাতে নির্বিশেষবাদ নিরস্ত হয়েছে। তিনি অচেতন নন। জড়জগতের জীবগণকে চৈতন্য দান করবার জন্য আশ্রয়ের ভাগবগ্রহণ করে শ্রীচৈতন্যদেব এসে চৈতন্যকথা বলে গিয়েছেন এজন্য তাঁর নাম 'চৈতন্য'। আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত, গুরু-পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত লঘুর কোন সুবিধা হয় না।

গৌরসুন্দর-রচিত "চেতোদর্পণ-মার্জনং" শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি—একথা বলা হয়েছে; এই নামকীর্তনের অভ্যন্তরেই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর-কীর্তন। কপটতাপূর্বক নামকীর্তন ত্যাগ করে রূপাদি কীর্তন করলে চিত্তদর্পণ মলিনই থাকবে। তাহলে ভাগবত পড়াশোনা হবে না। চৈতন্যদেবের আনুগত্যে শুনতে হবে। তা হলেই ভাগবত লাভ করতে পারব। আজকে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-সম্বন্ধে অধিক বলার সুযোগ হয় নি।

পঞ্চম দিবস

(২০ শে আগষ্ট, ১৯৩৫, মঙ্গলবার)

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া শমদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া।।

[হে দায়নিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাতে সম্পূর্ণ নির্মলতা আছে, যাতে পূর্ণ সুরভি বিস্তার লাভ করে বা পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করে) প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস দান করে এবং রসবর্ষণ-দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহা নিত্য সেবা-প্রবৃত্তি বিধান করে, সর্বদা ভগবন্নিষ্ঠা দান করে, যাহা মাধুর্যমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাদৃশী—নবলক্ষণা তোমার সেই দয়া সর্বাশুভ-নিরাস করে জগন্মঙ্গল বিধান করুন।]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব দয়ানিধি, তাঁর দয়া অমন্দ উদয় করায়। জীবের ভবিষ্যতে যা মন্দ উদয় করায়এবং আপাত সৌখ্য সম্পাদন করে, সে প্রকার দয়াকে নিত্যকাল শুভপ্রদান কারিণী দয়াবলা যায় না। কিন্তু দয়ানিধি—যাঁর অবিতরণীয় পদার্থ কিছু নেই, যিনি অনায়াসেই অমন্দোদয়া দয়া বিতরণ করতে পারেন, সেই চৈতন্যদেব বলছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীমূর্তির অঙ্ঘ্রি-সেবা, সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, মথুরাবাস—এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হতেই জীবের ভক্তি বৃদ্ধি হয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে। যাঁদের বিচার ধর্ম-অর্থ-কাম—ইহ ও পর জগতে নিজ সৌখ্য লাভ অথবা বিষয়ভোগাভাবজনিত মোক্ষপ্রাপ্তি, তাঁদের ভাগবত-শ্রবণের আবশ্যকতা নেই। চতুর্বর্গপ্রয়াস যে কাল পর্যন্ত জীব-হৃদয়ে বর্তমান থাকে, তৎকাল পর্যন্ত ভগবদ্‌বস্তুর কথা স্থান পায় না।

গতকল্য আমাদের কিছু উরুক্রম অধোক্ষজ ভগবানের কথা হয়েছিল। সেই উরুক্রম, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ ভগবানের পরিবর্তে অপরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়, নির্বিশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ পাই, সেইগুলি অপূর্ণতার জ্ঞাপক বলে অমন্দ উদয় করাতে অসমর্থ। তাতে বাস্তবিক ভগবানের দয়া লাভ হয় না। কিন্তু দামোদরস্বরূপ—যিনি বেদান্তশাস্ত্রে পরম পারঙ্গত, যাঁর পূর্ব নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন-জন্য বারাণসীতে গিয়েছিলেন, তাঁর বিচার ছিল মানবের মঙ্গলসাধন করা, কিন্তু যখন জানলেন চতুর্বর্গ প্রয়াসে মঙ্গল হয় না, তখন হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের স্ফূর্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ার্থ পুরুষোত্তমে গিয়ে তাঁর নিকট ঐ অমন্দোদয়া দয়া প্রার্থনা করেছিলেন। সেই দয়া নয় প্রকারে উপস্থিত হয়—(১) হেলোদ্ধূলিত- খেদা (২) বিশদা, (৩) প্রোন্মীলদামোদা, (৪) শাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদা, (৫) রসদা, (৬) চিত্তার্পিতোন্মাদা (৭)শশ্বদ্ভক্তি বিনোদা (৮) শমদা এবং (৯) মাধুর্যমর্যাদা।

"আসামহো .... ভেজুর্মকুন্দপদবীম" শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে, যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পাত্র, যা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতিসকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তু মুকুন্দপদবী। তাঁর ভজনা কখন বা কার দ্বারা সম্ভব? আর্যপথ ও স্বজন পরিত্যাগের শক্তি যাঁদের হয়েছে, যাঁরা তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর করে কৃষ্ণ-প্রতি নির্ভরতা-পরিত্যাগের বিচার-বিশিষ্ট নন, সেই আর্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মুকুন্দ পদবী- সেবনে সমর্থ। সেইটী সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তা অনেকসময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ঃ" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হয়ে আমি খুব বুঝেছি মনে করে অহঙ্কার-বিমূঢ় হই। তৎপ্রতীতির কর্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝতে পারি না। আমি প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গল-প্রার্থী হলে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনধর্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যারা নিত্যমঙ্গলের পরিবর্তে সাধারণ অমঙ্গল-লাভে তৎপর, তাদের চিন্তাস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্যয় ঘটায়—ইহ-জগতে ভগবদ্রস-রহিত হয়ে জড়রসকে বহুমানন করে তাতে উন্মত্ত হলে চেতনময় রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয়, তা হতে বঞ্চিত হতে হয়।

দুই প্রকার রস পাওয়া যায়—একীট প্রেয়ঃপন্থায় আর অপরটী শ্রেয়ঃপন্থায়। প্রেয়ঃপন্থায় জড়ভোগকারীর কাব্যশাস্ত্রে যে রস আস্বাদনের কথা আছে, তা আস্বাদন করতে গিয়ে বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আস্বাদনকারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল রস আস্বাদিত হন না। শ্রেয়ঃপন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃত-গ্রন্থে বলেছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাহপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী।।

মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা নানা অসুবিধার মধ্যে থাকে। কোনটী ভাল কোনটী মন্দ—এপ্রকার বিচার এসে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেয়ঃপন্থী হলে শ্রেয়ঃপন্থিগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হতে বিরাগই আশ্রয়ণীয়। বর্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়-পরিচালনা হতে যে জড়বিলাস, তা থেকে পৃথক বা তার বিপরীত বিরাগ; কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। জড়বিলাস ও জড়বিরাগকে অপরভাষায় ভোগ ও ত্যাগ বলা হয়। ভাগবত বলেছেন—

নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে৷
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

যে কিছু কাজ করব, তা ধর্মের জন্য না হয়; আবার ধর্ম করলেও তা ভোগের জন্য সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয়; বিরাগওআবার তীর্থপদসেবার জন্য না লাগুক; এই রকম বিচার যতদিন থাকে, ততদিন—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"। সেইকালে চেতনের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করতে থাকি। তাকে জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থা বলা হয়েছে। প্রেয়ঃপন্থা দ্বারা চালিত হয়ে—ঈশ-সেবা-বৈমুখ অবলম্বন করে জড়রসে প্রমত্ত হয়ে পড়ি। আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দ-লাভের পন্থা দুইপ্রকার,—প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দ-লাভে যে দোষ, সেটা বিরাগের পন্থায় স্খালিত হয়। আমরা কর্তৃত্বধর্মবশে যে কর্মের আবাহন করি, তাতে যে রসের উদয় হয়, শ্রেয়ঃপন্থী বলেন—তা ত্যাগ করা কর্তব্য। বিলাসের বিপরীত কথা বিরাগ। শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া

এ উভয় বিচারের অতীত। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের পদার্থ যে মুকুন্দ-পদবী, তাঁকে ভজন করেছিলেন মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমসিদ্ধা সর্বোত্তমা গোপীগণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন-জন্য যে বিচার-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকেন তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না করে, স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করে অধোক্ষজবিচারে আশ্রয় জাতীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ করেছেন। গুণজাত সত্ত্ব-প্রধান বিচারে যেটা নির্ণীত হয়, তাকে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগের কোথায়? যাঁরা নৈসর্গিকী নিত্য উৎকট প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে সেবার জন্য যত্ন-বিশিষ্ট, বাস্তববস্তুবিচারে যাঁদের বাস্তব রস হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ করেছে, রজস্তমঃ বাদ দিয়ে—সত্ত্বগুণের ভাল কথা পর্যন্ত বাদ দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করেছেন, তাঁরাই শ্রেয়ঃপন্থী। যাঁদের জ্ঞানটি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁরা বিবর্তগ্রস্ত হয়ে ভগবজ্জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোলকল্পিত, জড়সবিশেষরহিত নির্বিশেষ জ্ঞানই বড়'—এই মায়ামরীচিকায় ঢুকেছেন,তাঁদের মঙ্গলের জন্য চৈতন্যদেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ণা দয়াকে অমন্দোদয়া বলেছেন। ভাগবতের অনুশীলনদ্বারাই সেই বস্তু প্রাপ্তব্য। এজন্য ''জন্মাদ্যস্য যতঃ'' আদি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্তিত হয়েছে। জড় বিশেষটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলে ভোগের বিচার হতে পরিত্রাণ-জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেয়। যেহেতু সুখভোগে দুঃখ, প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা পাই, সুতরাং বোধরাহিত্যই শেষ কথা বা বোধসাহিত্যের বিশেষানুসন্ধান-রাহিত্যই চরম পদবী—এতাদৃশ বোধ যাঁদের, তাঁরা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তর্ভুক্ত। সর্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্তবাদ আশ্রয় করে জড়তাকে বা জড়কে চিদ্‌ভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তাতে বাস্তব বস্তু কিছুই নেই। তাঁরা বলেন,—স্বল্প, সঙ্কীর্ণ, জড়ভোগ জ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে জড়াতীত ভক্তিপূর্ণ পুরুষোত্তমজ্ঞানের চেষ্টা সমজাতীয়, স্বল্পক্রমবিশিষ্টের চেষ্টার সহিত উরুক্রমের চেষ্টা সমজাতীয়। অজ্ঞতাবশে ভগবৎসেবা-বঞ্চিত হয়ে, ভগবল্লীলানুকূল বস্তুকে উপেক্ষা করে নির্বিশেষবাদকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বে স্থাপন করেছেন। চৈতন্যদেব তার অপ্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে মনুষ্যজাতির যে মঙ্গল করেছেন তাই আমাদের

প্রার্থনীয়। পূর্ণকে অপূর্ণ বলে স্থাপনের কুপিপাসা যাঁদের, তাঁরা মহা অসুবিধায় পড়েছেন। দামোদর-স্বরূপ নির্বিশেষ-বিচার-প্রণালী, যাতে নির্বিশিষ্ট মোক্ষই প্রার্থনীয়, তা হতে মুক্তিলাভ করে জড়সবিশেষে আসেন নি। প্রাকৃতসহজিয়ার 'প্রকৃতিজাত জগতেই বিচিত্রতা আছে, চিৎ-এর বৈচিত্র্য-বিচার জড়শক্তিরই অন্তর্গত'—এই বিচারে যারা প্রতিষ্ঠিত সেইসকল লোক ভাগ্যহীন। জড়সবিশেষে চিৎসবিশেষের বিবর্ত হলে অভীষ্টলাভের পরিবর্তে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। জড়রসটা ধ্বংস করে দিতে হবে, শুকিয়ে দিতে হবে কিন্তু 'রসো বৈ সঃ''—সেই সচ্চিদানন্দরসই ত থাকবে। তা না হলে প্রকৃতিবাদীর বৌদ্ধবিচার বা মায়াবাদীর তর্কমাত্র হয়ে যাবে। বুদ্ধকে সচ্চিদানন্দবস্তু বিচার না করে বৌদ্ধগণ স্বতন্ত্র জড়ভোগ্য অবাস্তব-বিচারবিশিষ্ট। জড়সবিশেষ-ধর্ম যেকাল পর্যন্ত নষ্ট না হচ্ছে, তৎকালাবধি প্রাপঞ্চিকতা নিয়ে বস্তুসান্নিধ্য হতে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে চেতনের উন্মেষ হবে, চিৎসবিশেষ বলে যে ব্যাপার, তা বুঝতে পারা যাবে, তখনই ভাগবত শ্রবণে অধিকার হবে। লীলা ক্রিয়া-মাত্র-উদ্দেশপরা নহে। 'মানবলীলা' বা 'দরিদ্রনারায়ণ'—এরূপ বিচার যাঁদের, তাঁরা ঘুরে ফিরে **Henotheism** (পঞ্চোপাসনা) বা **Impersonalism** (নির্বিশেষতত্ত্বে) প্রবিষ্ট হন। জড়-সবিশেষ হতে পার পাবার পরে যে রসের কথা আছে, তার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। উহা রসে জলাঞ্জলি দেওয়া মাত্র নহে। দহরোপনিষদে (ছান্দোগ্যে) যে সকল কথা আছে, যথা—''স যদি পিতৃ-লোককামো ভবতি . . . . . . মাতৃলোককামো ভবতি....... ভ্রাতৃলোককামো ভবতি . . . . . স্বসৃলোককামো ভবতি . . . . . সখিলোককামো ভবতি . . . . . . গন্ধমাল্যলোককামো ভবতি . . . . . যদি অন্নপান- লোককামো ভবতি . . . . . যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি . . . . . . স্ত্রীলোক কামো ভবতি . . . . . যং যমন্তমভিকামো ভবতি . . . . যং কামং কাময়তে সোঽস্য সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি তেন সম্পন্নো মহীয়তে।'' এই সকল বাসনা হলে 'ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি' বিচার হবে। কামদেব-কামনা উর্দিত হবার পূর্ব পর্যন্তই বাসনা মাত্র। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে' বিচার যদি প্রত্যক্ষানুমানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে **empericism** এসে গেল। আমাদিগকে জড়ের **relativity**-তে

আচ্ছন্ন করে 'উরুদাম্নিবদ্ধাঃ' করে রেখেছে। উরুক্রমের পাদস্পর্শযোগ্যতা হলে আধ্যক্ষিকগণের বিচারনৈপুণ্যের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করতে পারবো।

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া'---জীবহৃদয়ে যে সব অসুবিধা---তাপত্রয়াদিজনিত মলিনতা উপস্থিত হচ্ছে, তা হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য যত্ন করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, জড়জগতের অমঙ্গলের মধ্যেই থাকব, যদি জড়জগতের অমঙ্গলের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসতে থাকি, তাহলে ভবিষ্যতে সুখভোগলাভের সুবিধা হবে। কিন্তু পরমমুক্তপুরুষের বিচার তা নয়। ভোগরূপ ঘুমের ঘোর ছেড়ে মানুষ যদি চেতনবিশিষ্ট হন, নিজের পরিচয়, আত্মার পরিচয় পান, তা হলে অনাত্মপ্রতীতির অসুবিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময়ে মায়া সৃষ্ট হয় নি---অচিৎপরিণাম প্রবৃত্ত হয় নি, তখনও চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সকল বিচিত্রতা অবস্থিত ছিল, আছে এবং পরেও থাকবে। আধ্যক্ষিক-বিচারে আপেক্ষিকতা। ঈশ্বর কৃষ্ণের বিচার,---''অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।।''

ভাগবতসম্প্রদায়ে সাংখ্যায়ন, সনৎকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার করেছেন। নিরীশ্বর—সাংখ্য---বহুবস্তুর সমাবেশ বহ্বীশ্বরবাদ, Polytheism প্রভৃতি নানা বিরোধি সম্প্রদায়েরও অভাব নেই। যখন একায়নপদ্ধতি প্রচলিত ছিল (সত্য-যুগে), তখন একমাত্র নারায়ণের পূজা ছিল। 'একায়ন' মানে সংখ্যারহিত। যখন সে বিচার স্তব্ধ হল, তখনই ত্রেতায় ধ্যাননিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জীবের দুর্গতি হয়েছে। ত্রয়ী উৎপত্তি লাভ করে কর্মকাণ্ড সৃষ্ট হল পুরূরবার কাছ থেকে।

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একাঽগ্নির্বর্ণ এব চ।।
পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্বমেযিবান্।।

(ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯)

ঐ শ্রীধরস্বামীর টীকাঃ-----''ননু অনাদির্বেদত্রয়বোধিতো ব্রাহ্মণাদীনাম্ ইন্দ্রাদ্যনেকদেবযজনেন স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুঃ কর্মমার্গঃ কথং সাদিরিব বর্ণ্যতে তত্রাহ

এক এবেতি দ্বাভ্যাম্। পুরা কৃত যুগে সর্ববাঙ্ময়ঃ সর্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণব এক এব বেদঃ। দেবশ্চ নারায়ণ এক এব। অগ্নিশ্চৈক এব লৌকিকঃ, বর্ণশ্চৈক এব হংসো নাম। বেদত্রয়ী তু পূরূরবসঃ সকাশাৎ আসীৎ। এযিবান প্রাপ। অয়ংভাবঃ----কৃতযুগে সত্ত্বপ্রধানাৎ প্রায়শঃ সর্বেঽপি ধ্যাননিষ্ঠাঃ। রজঃ-প্রধানে তু ত্রেতাযুগে দেবাদিবিভাগেন কর্মমার্গঃ প্রকটো বভূবেতি।''

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

বর্তমান সময়ে হরিকীর্তনই একমাত্র সম্বল। তাতে জানবো বাস্তব বস্তু কি? সত্যপ্রতিম বস্তুর সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজনীয় নয়। 'বিশদা'---নির্মলা, 'আমোদ'---সৌগন্ধ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত হয়েছে যাতে; সৌগন্ধ নেই যাতে, এমন দয়া নয়--- নির্বিশিষ্ট হওয়া নয়। সুরভিযুক্ত পদার্থ। ভগবদ্দয়ারূপ বায়ুতে সমস্ত ধূলো অনায়াসে উড়ে যায়---ঝাঁট দেওয়া হয়ে যায়। কর্মমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদেরই যত কষ্ট। তদ্বিপরীতবাদির বিচার---অব্যক্ত।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।

কৃষ্ণচেতা যারা নয়, তাদের দুঃখ অবর্ণনীয়, তারা নিজের বিচারানুসারেই দুর্গতি লাভ করছে। তা থেকে অবসর পাওয়া দরকার। পুরূরবার কাম হতে বেদত্রয়ী আরম্ভ হল। পুরূরবা উর্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হয়ে কর্মকাণ্ড আরম্ভ করেছিলেন। রূপরসাদি বাজে জিনিষে আকৃষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। **Asthetic culture**-এ **relative activity** বর্তমান, উহা **empericist**-দের বিচার।

চৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়ার মধ্যে কর্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নেই। জীব যাতে ঐহিক আমুষ্মিক ভোগে রত না থাকে, তার জন্য চেষ্টা করেছেন।

'শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা'---জ্ঞানী শ্রেণীর যে চিন্তাস্রোতে---''অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, সেই গুরু পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়---গুরু ও আমি আলাদা নই, গুরু নিত্য নয়, আমি ঈশ্বরে বিলীন হয়ে যাব'', বাস্তব

সত্যের সন্ধান না পেয়ে হাতড়ান বুদ্ধিতে যে প্রয়াস, উহা অকর্মণ্য। 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য, শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য, যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ, নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং' প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন যে, ঐকার্যে অগ্রসর হয়ে পরিণামে বিফল-মনোরথ হতে হয়—বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়িভাবে থেকে যেতে হয়। মুক্তিকামী কপটতা আশ্রয় করে **Henotheism** এ সময় কাটিয়ে **Impersonal** হয়ে নিজের নিজত্ব —গুরুর গুরুত্ব পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলেন। চৈতন্যদেব এই সকল বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন। ভাগবত আলোচনা করলে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা থেকে অবসর হয়।

'রসদা'—জড়রসের সঙ্গে চিদ্‌রসের যে পার্থক্য আছে, সেইটি বুঝিয়ে দিয়ে প্রকৃত চিদ্‌রস দান করেন। উদ্বেলিত খেদ হতে বিবদমান বিচারের শান্তি হলে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। চিত্তে রস এলে উন্মাদ অর্পিত হয়, আস্বাদন-মত্ততা আসে, ব্রহ্মারসজ্ঞান প্রবল হয়। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বিষয় সকল অধিরোহবিচারে বুঝতে গিয়ে যে অমঙ্গল হয়, তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে চিত্তার্পিতোন্মাদা অবস্থা হয়।

'শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা'— সেই দয়া নিরন্তর সেবাপ্রবৃত্তিদান-কারিণী।

'শমদা'—'যা মন্নিষ্ঠতা' (ভগবন্নিষ্ঠতা) বুদ্ধি দান করে। ''জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্''—ভগবৎ, পরমাত্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে 'মে জ্ঞানং' অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞান পরম, অন্যগুলি সাধারণ—মধ্যম ও ইতর। বিশেষ জ্ঞান নির্বিশিষ্ট ব্রহ্মে নেই। কিছু পরমাত্মায় আছে, কিন্তু রহস্য নেই। ভগবজ্জ্ঞানে তদঙ্গ, রহস্য, বিজ্ঞানসমন্বিত জ্ঞান বিরাজমান। গোলে হরিবোল দিয়ে ব্যাপকতাধর্মে জড় ভোগপরতা ভগবদ্ভক্তিতে আরোপ করা উচিত নহে। যোগীদিগের বিচার-প্রণালীতে ঐশ্বর্যমর্যাদা আছে, বিভূতির আলোচনা আছে, কিন্তু মাধুর্য-বিজ্ঞানের অভাব থাকায়,—পরমৈশ্বর্য তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ঐশ্বর্যের শ্রেষ্ঠতা দরিদ্রের নিকট আছে। দরিদ্র ধনবান হলে ধনে ঔদাসীন্য—বীতরাগ আসে। মধুরিমায় আকর্ষণ বৃদ্ধি হলে সে-ভাব থাকে না। ভক্তি-দ্বারা ঐশ্বর্যের কিছু পেতে পারি, কিন্তু পরক্ষণেই মাধুর্য প্রবল হলে ঐশ্বর্যের অপূর্ণতায়

বাধ্য হই না। আমি বড় হব, অন্যে বশ্য থাক, এটা ঘুরে ফিরে অভক্তি। ভাগবতে যত শ্লোক আছে,তার সার নয় প্রকার উপলক্ষণে বিচার করে বৈদান্তিক শিরোমণি স্বরূপ-দামোদর এই স্বরচিত শ্লোকদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় করেছেন, তাঁ'র দয়ার সর্বোত্তমতা জানিয়েছেন। অধোক্ষজের সেবকই ঐ সকল কথা বুঝতে পারেন, অর্ধপক্ক রসহীন জ্ঞানীর উহা বুঝবার যোগ্যতা নেই।

আমাদের ভাগবত পাঠ করতে হবে। যে সকল কথা বললাম, এটা মঙ্গলা-চরণের অর্থ। আমি নির্বিশেষবাদী নই। ভাগবত হতে নির্বিশেষবাদ শত-সহস্র যোজন দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবলাদ্বৈতবাদের কোন কথাই ভাগবতে নেই। কেবল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আলোচনা করলে ভাগবতের উদ্দেশ্য কি জানতে পারা যায়। চরমে নির্বিশেষ কামী পঞ্চোপাসকগণণ মূলের সঙ্গতি রেখে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করতে পারেন না। করতে গেলে নিজেদের চিন্তাস্রোতের সর্বনাশ হয় জেনে একটা শ্লোকেরও টীকা করতে পারেন নি। যদি কেউ টীকা করতে যান, তার কিছু ভক্তির বিচার আসতে পারে কিন্তু চরমে নির্বিশেষস্থাপনপ্রয়াস ব্যর্থ হয় মাত্র। ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধও নেই, শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথা বলেছেন, তাহাই পরম প্রয়োজনীয়, তাতে ভুল নেই, উহা ভক্তিপূর্ণ। শুদ্ধদ্বৈতবাদও জড়ভোগনাশী ও ভক্তিপূর্ণ, দ্বৈতবাদ যেখানে জড়বিচারে পূর্ণ, সেখানে উহা শুদ্ধ নয়, বিদ্ধদ্বৈতবাদ আধ্যক্ষিকতা। ভাস্কর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার জড়ভোগবিচারাশ্রিত বলে ভ্রমপূর্ণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অসম্পূর্ণতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার দেখিয়েছেন, উহাতে অসম্পূর্ণতা ও বিবদমানতা নেই, উহাই সম্পূর্ণ বিচার। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচারের কথা যাদের হজম হয় নি, তারা সদর্থের পরিবর্তে কদর্থ করে প্রতিমুহূর্তে সত্যের অপলাপ করতে যত্ন করছেন। তা শুনতে গিয়ে ভাগবতের ভাল কথাগুলো ভুলতে হবে না। তিনি পুরুষোত্তম, উরুক্রম; অপরোক্ষ শব্দমাত্রদ্বারা উদ্দিষ্ট নহেন, তদতিরিক্ত 'অধোক্ষজ', প্রাকৃত নহেন 'অপ্রাকৃত'। চেতন ও অচেতনের রস এক করতে হবে না। ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ কর্মফলে যেস্থান লাভ করেছেন, এটা কারাগৃহ। এস্থানে 'অনয়া মীয়তে' বিচার —মেপে নেওয়া ধর্মই প্রবল। ভগবানের অঙ্গ নেই—যাঁদের বিচার, রহস্যসহ

জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তাঁরা অজ্ঞান বলেন, তাঁদের অজ্ঞতা জন্য অসুবিধা আছে।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ।।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।

প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্।।

[ভগবদ্বস্তু যাহা, ভগবানের ভাবসমূহ যাহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ যাহা এবং বিক্রমসমূহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদনুগ্রহক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে মুক্ত-জীবের অনুভবের বিষয় হয়। কৃপার অযোগ্য ভগবদ্বিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুণ্ঠ বস্তুতে, ভোগ্য ভাবাদিতে, ভোগ্য রূপ, ভোগপর গুণ এবং জড়ানন্দপর বিক্রান্তি-সমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কারবিমূঢ়তা-হেতু মায়াবাদী হয়ে পড়েন।

কালের খণ্ডধর্মানুভূতির পূর্বে ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাঁরই অধিষ্ঠান। জড়সত্তা ও জড়ভোগাতীত অনধিষ্ঠান হতে তিনি পৃথক বস্তু হয়েও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হতে পৃথক নন।

ভগবদ্বস্তুর প্রতীতির অভাবে যাহা অনুভূত হয়, ভগবদ্বস্তু ব্যতীত যার অনুভূতিগত অস্তিত্ব নেই, পরমাত্মবস্তুতে যার অনুভূতি নেই তাই মায়া। মায়ার পরিচয় দ্বিবিধ—জীবমায়া আলোকময়ী ও অন্ধকারময়ী গুণমায়া। শক্তিমদ্বস্তু ও শক্তির বিচারে ভ্রান্তিনিরসনার্থ এই সংজ্ঞা।

অভিধেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাত্ত্বিকের জানবার চেষ্টা নেই। অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবদ্বয় দ্বারা সর্বদা সকল স্থানে সেই ভগবদ্বস্তুর শ্রবণাদি বিধেয়।

যেরূপ মহাভূতসকল নীচোচ্চ প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট-প্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্তহৃদয়ে নিত্য প্রবিষ্ট হয়েও ভগবদধিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতারক্ষণ দ্বারা প্রেমভক্তির নিত্য প্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞ-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।]

বাস্তবিক অভক্তগণ কখনই ভাগবত পড়তে পারে না। তারা ভুক্তি ও মুক্তিপিপাসু—কর্মী ও জ্ঞানী।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।

তাবদ্‌ভক্তিসুখাস্বোধেঃ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।।

কর্মিজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হবে। প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্ম-চালিত হয়ে এই ভাল, এই মন্দ বিচারে ব্যস্ত। 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম।' জড়নির্বিশেষ, জড়সবিশেষ পরিত্যাগ করে যুগপৎ চিন্নির্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বিচারই গ্রাহ্য, উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বিচার।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।

পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।

যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।

ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোক-মোহ-ভয়াপহা।।

[ভক্তিযোগপ্রভাবে স্তব্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে জীব সত্ত্ব-রজস্তম-গুণত্রয়াত্মক জড়াতীত হয়েও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হতে জাতকর্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে।

শ্রীব্যাসদেব দেখলেন যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হলে সংসার- ভোগদুঃখ নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করে সর্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করলেন। এই পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।]

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্যন্ত জীব আধ্যক্ষিক থাকে। ভাগবত---পারমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ---পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি বলছেন, তা জানতে হলে, আলোচনার ইচ্ছা থাকলে দশম স্কন্ধ আলোচনা করতে হবে। দশম স্কন্ধ আলোচনার পরে একাদশ স্কন্ধ না পড়লে অধঃপতন হবে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য, ভাগবত শ্রবণেই অন্যান্য চারটি অঙ্গ ---সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, শ্রীমূর্তির অঙ্ঘ্রিসেবা, মথুরাবাস হবে। মথুরা---জ্ঞান-ভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস, অচেতন ভূমিকায় বাস না করার নাম মথুরাবাস। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অঙ্ঘ্রিসেবার পদ্ধতিসমূহও ভাগবতে আছে।

চৈতন্যের চরণ আশ্রয় করলে 'আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে' বিচার উপলব্ধি হবে, তখন রসবোধ হবে। জড়রসবোধ থাকলে চিদ্রসমূর্তি ভগবানকে বুঝা যায় না। নির্বিশেষ বিচারে জড়রস ধ্বংস হয় মাত্র। তা থেকে অব্যাহতি নিয়ে যাতে আবার জড়রস প্রবল না হয়, তজ্জন্য চিদ্রসের আলোচনা দরকার। সেটি নামকীর্তন হতেই সম্ভব। নামই রসবিগ্রহ।

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

রসবিপর্যয়ে যে রসদর্শন, জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে রস, কাব্যপ্রকাশ, ভরতমুনি প্রভৃতির যে বিচার উহা শুদ্ধ নহে। উজ্জ্বলনীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি পাঠে চিদ্রসের উপলব্ধি হয়। চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হলে সকল অমঙ্গল দূর হবে। জড়নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে অবসর পেতে হবে। দুটিকে এক করতে হবে

না। জড়ের সঙ্গে চিদ্রসের সাম্য বিচার যাঁরা করেন, তাঁরা অপরাধী। পরবর্তিসময়ে সিদ্ধ হয়ে যাব বিচার করে তাঁরা 'সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ' শ্লোকের উদ্দিষ্ট হন। ভগবান তাঁদের রসরহিত নীরস ব্রহ্মবিচার ধ্বংস করে দেবেন। যেমন কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির অবস্থা।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁর রসের উরুক্রমতা দেখালে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে আধ্যক্ষিকতা, মহাজ্ঞানী মহাকর্মীর যে অহঙ্কার সব ধুয়ে যাবে। চৈতন্যদেব বলেছেন, 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।' ২৪ ঘন্টা ভগবানের আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত শুনতে হবে। বিপথগামী হলে প্রথমে নির্বিশেষবাদী, তার পরে জড় সবিশেষ। পাব পাব করে প্রত্যেক নির্বিশেষবাদীর শেষে সর্বনাশ---অধঃপতন হবে। সর্ব মায়াময় বলতে বলতে বৈকুণ্ঠকে পর্যন্ত মেপে নেওয়ার চেষ্টায় শেষে তিন এর dimension-এ প্রবিষ্ট হয়ে জড়তা লাভ করে বিষম ক্লেশের মধ্যে পড়বেন। ক্লেশঘ্নী ভক্তির আশ্রয় না করলে---ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করলে সর্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ করতে পারে না। তার মুখে ভগবান (ভগবন্নাম) আসতে পারেন না; পঞ্চোপাসকের বা অঘ, বক, পূতনার অনুগতজন-মুখে ভাগবত শুনতে নেই। কৃষ্ণ আঠার রকম অসুরকে যে প্রকার গোকুলে ধ্বংস করেছিলেন, তদ্রূপ এই সমস্ত অঘ-বক-পূতনার ভৃত্যবর্গের অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ করবার চেষ্টা-রূপ যে পাষণ্ডমত, কৃষ্ণ তা ধ্বংস করে দেবেন। অসুরদের অনুগমন বা তাদের বহুমানন কর্তব্য নয়, তাদের অনুগ্রহ প্রার্থনীয় নহে। যে যে নামে দেবতা আছেন, তত্তন্নামে অসুরও আছে। তারা মানুষকে ভ্রান্ত করে চেতনধর্ম-রহিত করে দেয়। সুতরাং ভগবদ্‌ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু।

ষষ্ঠ দিবস

(২৩ শে আগষ্ট, ১৯৩৫, শুক্রবার)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

আমি সেই মহাপুরুষের চরণ বন্দনা করি, যিনি শিববিরিঞ্চি-নমস্কৃত অর্থাৎ মহাদেব-ব্রহ্মাদি যাঁকে সর্বদা প্রণাম করেন। তিনি জগদ্‌বরেণ্য, তাঁর আশ্রয় সকলেই আকাঙ্ক্ষা করেন। তিনি সংসারের মলিনতা সর্বতোভাবে দূর করতে পারেন। আমাদের যে প্রার্থনা হওয়া উচিত, তিনি তদনুসারে ফল দান করতে পারেন। তিনি ধ্যানযোগ্য। জড়পদার্থগুলি ভোগ্য, তাহারা ধ্যেয় নহে। তুমিই তোমার সেবাকারী ব্যক্তির ক্লেশ মুক্ত করিয়া থাক। তুমিই প্রণত জনগণের পালনকর্তা। তোমার চরণ ভবসমুদ্র পারের নৌকা-স্বরূপ। তুমি সেই মহাপুরুষ, তোমার চরণ বন্দনা করি। এই মহাপুরুষটি কে? শ্রীমদ্ ভাগবতের আদিশ্লোকে ইঁহারই ধ্যানোপদেশ পেয়ে থাকি,—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তোজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

সেই পরমেশ্বর বস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। বশ্য বস্তু—অধীন জগৎ ঈশ্বর নন; কিন্তু পরমেশ্বরই ধ্যানের বিষয়, যে মহাপুরুষের কথা পরে 'ধ্যেয়ং সদা' শ্লোকে বলেছেন।

মহাপ্রভু বলেছেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

ভাগবত নিগমশাস্ত্রের সর্বপ্রধান পুস্তক। উহাই বাস্তববস্তুর সন্ধান দিয়েছেন, যাতে আমাদের মত লোক সেই ভগবদ্‌বস্তুর সেবা করবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয়। আমরা সর্বদা সেবা-বিমুখ। সেব্যের দর্শনে সেবকের সেবোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে।

ভাগবতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা বলেছেন। বেদশাস্ত্র যে সম্বন্ধের কথা বলেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণীত হয়েছে প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যে। সেই পরম ও সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউন। ভোগ্য জগৎ ধ্যান করতে করতে আমাদের বহু জন্ম কেটে গেছে। ভাগবত লেখক ব্যাসদেব বলেন,—"ধীমহি" অর্থাৎ ধ্যায়েম—আমরা সকলে মিলে ধ্যান করি। ধ্যানের যোগ্যতা আমাদের আছে; কিন্তু যেকাল পর্যন্ত সেব্য পরমেশ্বর ব্যতীত ভোগ্যজগতের কোন ইতর বিষয়ের ধ্যান করি, তৎকাল পর্যন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, ভোগ হয় মাত্র। যা আমাদের অধীনবস্তু, যাকে ভোগ বা ত্যাগ করতে পারি, তারই ধ্যান হয়ে যায়। 'আমাদের'—বহুবচনের পদ। আমরা অনেক,কিন্তু সেব্য এক। 'পরম্'—একবচন। একমাত্র বস্তু তিনিই ধ্যেয়। আমরা সকলে ধ্যেয়পদার্থের সেবা করি। ধ্যাননিষ্ঠা সত্যযুগের ব্যাপার। যখন একপাদ ধর্মও হ্রাস হয় নি, দ্বিপাদ বা ত্রিপাদ ধর্ম নাশ হয় নি, তখন ধ্যাননিষ্ঠাই ছিল, কিন্তু তাতে ব্যাঘাত হয়েছে ভগবদ্ বিস্মৃতি-হেতু।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।

সত্যের প্রারম্ভে ভক্তিপরের পরমেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল। তখন সর্বকালভোগ্য ইতরবস্তু ধ্যেয় ছিল না বলে নারায়ণের ধ্যান সম্ভব হত। কিন্তু পাপ প্রবেশ করায়—একপাদ ধর্মের হানি হওয়ায় জীবের সত্যের ধ্যাননিষ্ঠা কিছু বিপন্ন হয়েছিল। তাতে যজ্ঞের ব্যবস্থা। তখন কতকগুলি লোকের সৎকর্মনিষ্ঠা প্রবল হয়েছিল। জীবের নিত্য কৃত্য কর্মনিষ্ঠার মধ্যে যজ্ঞদ্বারা যজনকার্য হত। একপাদ-ধর্মক্ষয়ে ধ্যান করতে হলে যজ্ঞসাহচর্যে পূর্ণতা লাভ করত। পরবর্তিকালে দ্বাপরে পরিচর্যা শ্রীমূর্তিসেবার বিচার প্রবর্তিত হয়েছিল।

এই হস্তের দ্বারা অর্চার সেবা করে সেবোন্মুখতা প্রকাশ করতে পারি। হস্তদ্বারা আহৃত উপকরণ দিয়ে পূজা করতে পারি। অর্চা পঞ্চম স্তরে অবস্থিত ভগবৎপ্রকাশমূর্তি। যা আমরা সম্মুখে দেখছি (শ্রীমূর্তির দিকে লক্ষ্য করে) ইনি অর্চা অবতার। যেকালে অর্চনীয় বিচারে সচ্চিদানন্দবস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন অসৎ, অচিৎ নিরানন্দের কল্পনা সেই ভগবদ্ বস্তুতে আরোপ করি না। অর্চনের পূর্বে 'ভূতশুদ্ধি' বলে একটা ব্যাপার আছে, যাতে করে বর্তমান অর্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগী ভাবে পরিণত হয়। উপচারগুলির প্রোক্ষণকার্য দরকার হয়। অর্চা ভগবানই; কিন্তু পাঁচটি স্তর অতিক্রম করলে সেই পরমতত্ত্বের ধ্যান হয়। পরিচর্যাবিধানে পাঞ্চরাত্রিক অর্চন-পদ্ধতি। সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্যামিসূত্রে ভগবদধিষ্ঠান। তিনি অপর ভাষায় পুরুষাবতার বলে কথিত।

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।।"

অর্চার উপাসনা সব সময়ে করতে পারি। সাক্ষাদ-বিগ্রহজ্ঞানে কালোচিত সেবা করার যোগ্যতা আমাদের সকলের আছে, কিন্তু অন্তর্যামীকে সবসময় চিত্ত ধারণা করতে সমর্থ হয় না। অর্চা প্রত্যক্ষের উপযোগী। সেব্য-অর্চা ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তাঁতে সেব্য-বিচার থাকা দরকার। যেমন বিগ্রহ-সমক্ষে চেঁচিয়ে কথা বললে, বিষয়কার্য করলে, তাঁর সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে অপরাধ হয়, কোন বেয়াদবি চলে না। সেবাপরাধ ৩২ প্রকার বিচার্য হয়। যখন তাঁর ধ্যান নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়েছিল, তখন অর্চনের বিধান হয়েছে। যদিও উপরিচর বসু সত্যযুগে শ্রীবিগ্রহের উপাসনা করতেন, কিন্তু দ্বাপরেই উহা প্রসার-লাভ করেছে। অর্চনে ধ্যান বলে একটা ব্যাপার আছে, উহা অন্তর্যামী, বৈভব ও ব্যূহ অতিক্রম করে পরতত্ত্ব-জ্ঞানসহ সেবা। ভোগের চিন্তা না করে সেব্যের চিন্তা করলে ধ্যান সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। অর্চাকে পার্থিব ব্যাপারে গঠিত মনে করলে ভোগ্যবিচার আসে। যখন ধর্মের ত্রিপাদ অধর্মে গ্রাস করে, তখন একমাত্র কীর্তনই গতি। উদরভরণজন্য অর্চ্যের পূজায় ব্যস্ত

থাকলে বিপথগামী না হয়, এটা দেখা দরকার। দ্বাপরীয় অর্চন যখন নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা অভিভূত হয়েছিল, তখন হরিকীর্তনের ব্যবস্থা---হয়েছে,—'কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ'। হরিকীর্তনেই অর্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিপাদধর্মের বিপর্যয়হেতু একমাত্র হরিকীর্তনের ব্যবস্থা। তৎপ্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্ঠাও লাভ হয়।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ।।"

আমরা কীর্তন করতে করতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হতে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চননিষ্ঠা---সবই কীর্তনে হয়। 'কলি' অর্থ বিবাদ। যে কোন কথা বলা যায়, তার প্রতিবাদ- যোগ্যতা আছে। একপক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ করবে। কলি দোষসমুদ্র। তার বহু দোষ থাকলেও একটি মহাগুণ আছে যা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। অত্যন্ত অযোগ্য বলে দুর্বলের জন্য যে ঔষধি, সেটি এমন তীব্রশক্তিসম্পন্ন যে, ঐ তিনপাদ ধর্মের অযোগ্যতা পর্যন্ত বিনষ্ট করে ফল প্রদান করতে সমর্থ হয়। কৃষ্ণলীলা দ্বাপরান্তে গুপ্ত হয়েছিল। কৃষ্ণকীর্তন সকল লোকেই জানতে পেরেছিল। যেমন কালকের সূর্যোদয় সূর্যাস্ত, আজকের সূর্যোদয় সূর্যাস্ত লক্ষ্য করলে খুবই টাটকা মনে হয়, সেরূপ দ্বাপরের শেষে কলির প্রবৃত্তিতে কৃষ্ণ নিত্যপ্রকটলীলা সঙ্গোপন করে বর্তমানে কীর্তন-মুখেই অবস্থান করছেন। অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণপ্রাকট্যকালে কৃষ্ণের নিত্য গুণ, লীলা, পরিকর, রূপ ও নাম---এগুলি শৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চেতনের দর্শনে দেখবার সুবিধা হয়েছিল। কলি-প্রবৃত্ত হওয়ার পরে কৃষ্ণের কীর্তন-দ্বারাই কর্ম বা জ্ঞান-প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত অমঙ্গল হতে অনায়াসে মুক্ত হয়ে নিত্য রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদির দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে।

আমরা জড়জগতে মেপে নেওয়া ধর্মে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা পড়েছি। কৃষ্ণকীর্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্তন হলে দর্শন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্মাল্যঘ্রাণে কি সৌগন্ধ আছে, তা কৃষ্ণকীর্তনে বুঝতে পারি। যেমন সনকাদি ভগবানের গুণে মুগ্ধ হয়ে ভগবৎসুরভির গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। কীর্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। "প্রোন্মীলদামোদয়া"---'আমোদ'-শব্দে সুগন্ধ, সুরভি। কীর্তনের দ্বারা

সেই সুরভির লাভ হয়, ভোগের উপকরণ এসেন্স-আতরাদি শোঁকা দুর্বুদ্ধি নষ্ট হয়। তৎপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ হয়ে সেই পরমপুরুষের নিকট যাওয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ হয়।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

সেবোন্মুখচিত্তে কীর্তনপ্রভাবে স্বয়ংরূপ আপনা হতেই দেখা দেন। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়।

'সত্যং পরং ধীমহি'—পরমেশ্বর বস্তুকে আমরা যোগ্য হয়ে সকলে ধ্যান করি। সেই বস্তুটি কি? সত্য, বাস্তববস্তুবেদ্য পরমেশ্বর। পরমেশ্বরের মুখ্যপ্রকাশ সত্য। 'সৎ' শব্দে নিত্য বর্তমান থাকা। জড়জগতের পদার্থ ভোক্তার নিকট কিছুদিনের জন্য উপস্থিত হয়, পরে থাকে না। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠান তাৎকালিক, উহা সত্যাভাস। এই সত্য অপর সত্যের আগমনে বিজিত হবার যোগ্য—নিজাধিষ্ঠান রাখতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বর অবিচলিত অচল ধ্রুব সত্য, ইহা অন্য বস্তুদ্বারা আবৃত হবার যোগ্য নয়। সেটি সেই ধ্যেয়বস্তুর মুখ্যলক্ষণ। এই সত্য জগতের মলিনহৃদয় জীবের নিকট নানাপ্রকারে প্রতিভাত, অনেকপ্রকার অসত্যের আবরণে বদ্ধজীবহৃদয় আবৃত।

'ধাম্না স্বেন'—'ধাম' অর্থ কিরণ, আলোক, আশ্রয়। বাস্তবসত্যের যে ধাম, তার দ্বারা বদ্ধজীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা কপটতা নিরস্ত হয়েছে। 'কুহক' শব্দে আবরণ, ছলনা। আপাতদর্শনে যে ব্যাপার, সেই জিনিষটি তা নয়। নিরাস করবে কার দ্বারা? —স্বেন ধাম্না। সত্য হতে কুহক নিরস্ত না হবার যে অবস্থা অর্থাৎ ধর্মার্থ-কামমোক্ষ-প্রাপ্তির উদ্দেশে তাৎকালিক সত্যগ্রহণের যে পিপাসা, সেটুকুমাত্র নয়। 'সদা'—নিত্যকাল সত্য। খণ্ডকালে 'সদা' হতে পারে না, ঝাকিদর্শনের ন্যায় ব্যাপার নয়, সর্বদা ধর্মার্থকামমোক্ষচালিত হয়ে পরমেশ্বরের অনুশীলনের নামে সত্য বলে যে অবান্তর ব্যাপার আছে, তা নয়। পরমেশ্বর নিরস্তকুহকসত্য, সর্বদা সত্যমণ্ডিত, নিত্য বর্তমান। সচ্চিদানন্দবিচাররহিত হয়ে যে গুণান্তর্গত ভোগ্যবস্তুবিশেষের অনুসন্ধান, সেটি ভোগ্য জ্ঞানেরই অন্যতম। প্রাকৃত-

সহজিয়াগণ নিজেকে কিশোরীজ্ঞানে যে ভোগ্য কিশোরের ভজন করেন, নিজ জড়ভোগ্যা নন্দানুভূতিকে প্রবল রেখে কৃষ্ণানন্দানুভূতিতে বাধা দেন অর্থাৎ গোপীর নিত্য আনুগত্য ছাড়া যে ভজন, তা কুহকাবৃত। ভাগবতে ভগবানই বেদ্য, চৈতন্যদেবের উদ্দিষ্ট ভগবানের বিচার হতে পৃথক করে মলিনহৃদয়ে যে কৃষ্ণাবির্ভাবের কথা বলি, সেটা দোষযুক্ত, তা 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহক' হয় না। কেউ যদি বলেন, তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মশব্দবাচ্য বা পরমাত্মা-শব্দবাচ্য হউন, তা হলে 'ভগবান' শব্দে চতুর্বর্গচেষ্টাজন্য বিরোধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য ভাগবতে সেই কপটতার আবরণ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। মেপে নেওয়া ধর্মে আচ্ছন্ন থেকে বস্তুসম্বন্ধে যে পৃথক কল্পনা, তা হতে অবসর পাওয়া দরকার। কুহকের একটু বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন—'তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ।' ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম প্রভৃতিতে একের বদলে অপর দর্শন, উহা ভ্রান্তিপূর্ণ বা বিবর্তদর্শন। যেমন মায়ামরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, নিকটে গিয়ে দেখি জল নেই। আপাতদর্শনে যে ভ্রান্তি, এককে অপর জ্ঞান, একের স্থানে অন্য ভ্রান্তি, আকাশ দেখে সমুদ্রভ্রান্তি, তেজে বারিভ্রান্তি ইত্যাদি, এটা বিবর্ত। তেজ, বারির বদলে যে অন্য ধারণা, তাতে কুহক উপস্থিত।

'মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ'—যাতে সূরিসকল মূঢ়তা লাভ করেন; সূরিতে আত্মম্ভরিতা আছে। মূঢ় হওয়ার যন্ত্র—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।" আমি বেশী বুঝদার—এটা যে বলে, সে ততটা ভুল বুঝেছে। মূঢ় হওয়ার সহজ রাস্তা এটা—foolishness made easy.

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।।"

(কেনোপনিষৎ)

যিনি বলেন, 'আমি জেনেছি', আমি 'পাকা বোষ্টম্' হয়েছি, তিনি হরিভক্তির রাস্তায়ই চলেন না। আমাদের ভ্রান্তি পদে পদে হয়, কুহকদ্বারা আবৃত হওয়ায় সত্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হয় না, যেকাল পর্যন্ত না তাঁর আলোকে আলোকিত হই। যেমন চক্ষু থাকলেও আলোকের অভাবে অন্ধকারে হাতড়ান হয়ে যায়।

'যত্র ত্রিসর্গো মৃষা'---এই সকল ক্ষণভঙ্গুর সসীম বস্তুর স্থান ভগবদ্বস্তুতে নেই, মায়াতে আরাধ্যের স্থান নেই। যেমন,---

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।"

ভগবানের মায়া দেখতে পাওয়া যায়না। তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। ভগবত্তার দর্শন ব্যতীতও মায়িক দর্শনের সম্ভাবনা নেই। মায়াতে ভগবান নেই। পূজা ও ভোগ্য-বোধ পৃথক। মায়া-নির্মিত ব্যাপার জগৎকে চাকরশ্রেণীর মনে করি, যেমন নাসাতে ঘ্রাণ গ্রহণ করছি, কানে শব্দ শুনছি---শুনবার মালিক আমরা, ইচ্ছা করলে নাও শুনতে পারি, অন্যমনস্ক থাকতে পারি। ভোগীদিগের ভোগ্যপদার্থজ্ঞানে অনেক অসুবিধা আসে। যাঁতে---পরমসত্যে ত্রিসর্গ অর্থাৎ রজস্তমঃসত্ত্বগুণ---জন্মস্থিতি-ভঙ্গ প্রভৃতি স্থান পায় না। গুণান্তর্গত রাজ্যে ত্রিগুণাতীত ভগবানের অধিষ্ঠান নেই।

'অমৃষা' বিচার করলে স্বরূপশক্তি, বহিরঙ্গাশক্তি ও তটস্থাশক্তিত্রয় যাঁতে পরমশক্তিরূপে অবস্থিত। অচিৎশক্তি হতে জগৎ---যা বদ্ধজীবের ভোগ্যভূমিকা। আমাদের এখানকার বদ্ধাবস্থায় চেষ্টা---যাতে কষ্ট কমে, তাই সুখ। অর্থাৎ দুঃখই এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপার। ভগবানে অনিত্য বিরোধী সত্তাদিগুণের অধিষ্ঠান নেই, শক্তিত্রয় নিত্য বর্তমান আছে। শক্তি-শক্তিমানের অভেদহেতু বস্তুর একত্ব। বিভিন্ন আংশিক প্রকাশদর্শনের যোগ্যতা আমাদের আছে। শক্তিগত-পরিচয়ে একায়নে অবস্থিত না হয়ে সাংখ্যায়নধর্মে অবস্থিত হতে পারি। এক যেখানে, সেখানে সংখ্যাগত বহুত্ব নেই। যেখানে একল, সেখানে সংখ্যাগত ভাগের সমাবেশ নেই। 'সাংখ্যায়ন বলতে নিরীশ্বর সাংখ্য, চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা বলছি না। পরজগতে---ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত জগতে সংখ্যাগত বিচিত্রতা আছে, কেবল নির্বিশেষভাবই যে তথায় নিত্য বিরাজমান, এরূপ নহে। Analytic বিচার---unity হতে diversity বিচার বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত বা একায়ন নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যায়নীয় বিচিত্রতাসমূহের সমষ্টির উদ্দেশে অভিযান শুদ্ধদ্বৈতবাদ বা চিন্ময়ভেদসিদ্ধান্ত একতাৎপর্যপর।

গুণাতীত জগৎ যা---ত্রিগুণাতীত জগৎ তা নয়, পরস্পর বৈষম্য---সমতার অভাব আছে।

ত্রিসর্গের আর একটি ব্যাখ্যা---গোকুল, মথুরা, দ্বারকা---ব্রজেন্দ্রনন্দনের তিনটি স্থান। হরি দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর, গোকুলে পূর্ণতম। পূর্ণতমতা পূর্ণবিকসিত-হৃদয়ে দেখতে পাওয়া যায়।' অখিলরসপূর্ণতমতা গোকুলে। মথুরামণ্ডল জ্ঞানভূমিকায় রসবিচারে 'তর' সংজ্ঞা।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাংশাস্তা স্বপিত্রোঃশিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।

এখানে দুটি মূর্তি---স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ; দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ-বিচারে পূর্ণতা হয়েছে। চারটি quadrant (বৃত্তপাদ) মিলে পূর্ণতা হয়েছে। মথুরায় প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ উপস্থিত নেই; গোকুলে স্বয়ংরূপ। বাসুদেবের প্রকাশ সঙ্কর্ষণ, বিস্তৃতি ---বিভুত্ব-বর্ণনে প্রকাশ। তত্ত্বপ্রকাশ-লক্ষণে বলদেবপ্রভুর পাদপদ্ম পর্যন্ত আমরা পৌঁছিতে পারি। তাঁ হতে চতুর্ব্যূহ। মহাবৈকুণ্ঠ বা মূলবৈকুণ্ঠে ইহা লক্ষ্য করি। যখন কারণ, গর্ভ, ক্ষীরবারিতেও নিজ নিজ প্রকাশ হন নি, তখন চতুর্ব্যূহ অবস্থিত। মথুরা জ্ঞানময়ী ভূমিকা, দ্বারকা চতুর্ব্যূহের লীলার স্থান, কিন্তু দ্বিভুজ-বিচারযুক্ত। চতুর্ভুজবিগ্রহধাম পরব্যোম অপেক্ষা দ্বিভুজবিগ্রহধাম দ্বারকার শ্রেষ্ঠত্ব। পরব্যোমে চার হাত, এখানে (দ্বারকায়) দু হাত। এটি (দ্বারকা) ভগবানের (কৃষ্ণের) নিজ স্থানের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠের অন্যতম। গোকুলে রসবিকাশের পূর্ণতমতা, অখিলরসামৃতমূর্তির পূর্ণলীলার প্রাকট্য। এখানে হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণাদি সাতটি গৌণরস পাঁচটি স্থায়িভাবকে সমৃদ্ধ করবার জন্য আছে। যদিও মথুরায় রৌদ্রাদি গৌণরস, বৃন্দাবনাদির মধুররসের কথা এখানে নেই, তথাপি মথুরা শুষ্কজ্ঞান-ভূমিকা নয়। স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু এসেছেন, ভোগের শুভ ethical principle জবাই হোলো রজকবধে। তিনি এত অপূর্ণ বস্তু নন, যাঁতে নীতির চাপ (ethical restriction) চাপিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বারকা, মথুরা, গোকুল

—এই ত্রিসর্গে যিনি নিত্যকাল অবস্থিত, সেই বাস্তববস্তুভাবত্রয়ের পরমেশ্বর বেদ্য। মানবকল্পিত জড়ের প্রভুজ্ঞানে উপনিষদ পড়তে গিয়ে যে ভুল করি—ব্রহ্ম-পরমাত্ম-বিচারে যে ভুল করি কিম্বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার "সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" মন্ত্রে যে আংশিক সমষ্টিবিষ্ণুর পূজার জন্য দৌড়াই, তিনি তাহা মাত্র নন। অবিনষ্ট-ত্রিপুটিপ্রবলকালে যে দুর্গতি হয়, সেটুকুমাত্র নন; পরমেশ্বরের কথা বলছি, তিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ব্রহ্মসংহিতায়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

অসম্যক আংশিক ধারণাবদ্ধ ব্রহ্ম-পরমাত্মার—সকল অবতারের সকল কারণেরও কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। চিৎসবিশেষ সচ্চিদানন্দ আকরের অবিনাশিনী আকৃতি যিনি সর্বক্ষণ রক্ষা করেন, দ্বাদশটি রস যাঁর সেবায় নিযুক্ত, তাঁর নিকট হতে সেই সকল রসের বিন্দু বিন্দু এজগতে ছুটে পড়েছে। তিনি পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—বিশেষরূপে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—এই শক্তিত্রয়কে গ্রহণ করেছেন। 'ত্রিসর্গ' শব্দে এই শক্তিত্রয়ের কথাও কেহ ব্যাখ্যা করে থাকেন। তিনি সত্যব্রত, ত্রিসত্য। সেই সত্যবস্তুকে এবং নশ্বরজগৎ-সৃষ্টিকারিণী বহিরঙ্গা শক্তি যাঁর, তাঁকে আমরা ধ্যান করি। সেই বস্তুর একটা **secondary emanation** এই ক্ষুদ্র জগৎ—**universe** রচিত হয়েছে। তিনের আয়তনিক বিচারে দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ আছে। চারের আয়তনের অবকাশ-মধ্যে ঘন (cube) গুলো আছে—ঘনাভ্যন্তরে বর্গজাতী দীর্ঘত্ব ও প্রস্থত্ব আছে। একের আয়তনে রেখাতল (linear suface), সবই এতে আছে। এতে আবদ্ধ থাকলে বদ্ধভূমিকার অনুমোদন ও প্রতিষেধক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। তিনের আয়তন দেখানোর জন্য ব্রহ্মাণ্ড—অণ্ড অভ্যন্তরের পদার্থ, বাইরের নয়—'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাৎ' যে ব্রহ্ম, তাঁর প্রকাশ-বিগ্রহ বিধাতারূপে যে ব্রহ্মা, তাঁর অণ্ড। প্রাগ্‌বৈদিকযুগে যখন নারায়ণের একলত্ব, তখন এই সব তিনের **dimension** এর রাজ্যের কথার বড়াই করবার ছিল না, এজন্য সে কথাকে বেশী বড় বলতে প্রস্তুত নই।

"অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি যতঃ"—এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব, যা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগ্রাহ্য, আমাদের ভোগ-ভূমিকা, এর জন্মাদি যাঁর প্রকৃতিশক্তি হতে। অহঙ্কার ছেড়ে ভক্তিমান হলে জানতে পারব, সেই নিত্য বস্তুর অচিৎশক্তি মায়াদ্বারা এ জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এখানে প্রত্যেকস্থানে গুণের **nerves** (শিরাসকল) দেখতে পাই। গুণজাত জগতের কথা বর্ণন করতে গিয়ে বলেছেন—গৌণ—**secondary eclipsed manifestation.** এটুকু অস্তিত্ব মাত্র বিচার করলে ঈশ্বরশক্তিকে ছোট করে দেওয়া হয়। জগৎটা কারাগার—**reformatory of imperfection.** ভক্তি ভ্রান্ত বদ্ধ জীবকে বিষম সন্দেহগর্তে পরীক্ষাজন্য প্রভু সাজিয়ে তোমার ভোগ্য বলে এই কারাগারে ভোগের ব্যাপারে আবদ্ধ রেখেছে। অন্য বাজে জিনিষ দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হচ্ছে যে নিত্যসেবকের সেবা ব্যাপারটি, তার কথা সম্বন্ধজ্ঞানের সময় বলা হচ্ছে। শক্তিবিকার হতে জগৎ উৎপন্ন। বিশ্বের **Cosmology**—উদ্ভব কিরূপে হয়েছে? **Abraham begets** ইত্যাদি এরকম ধরণের কথা নয়। 'অন্বয়াদিতরতঃ'। **Manifestive phase**—লীলাবিচিত্রতাপূর্ণ নিত্যজগৎ এখানে আবৃত—(eclipsed) হয়েছে, তাতে প্রকৃতদর্শনে বাধা (imperfection) এসেছে। এটা ছায়া জগৎ; যার ছায়া, সেখানে যাওয়া দরকার। ছায়াকে বস্তুজ্ঞান করলে অবস্তুতে 'বস্তু'-ভ্রম হয়। বাস্তবজগৎ—গোলোক-বৃন্দাবন, সেখানে বিষয়—এক, আশ্রয়—বহু। তিনি সেব্য, অসংখ্য জীব সেবক। একমাত্র সেব্যের সেবা ব্যতীত সেখানে অন্য ধর্ম নেই। কুকুরের সেবা করে ভাঙ্গী, ঘোড়ার সেবা করে সহিস, ঘোড়া গরুর চিকিৎসা করে **Veterinary Surgeon** হওয়া বা **altruistic enterprise** বা পরার্থিতা করে, মানুষের সেবা করতে গিয়ে ভগবদ্‌বিস্মৃতি। আবার পীত বা কৃষ্ণ চামড়া হলে পরার্থিতার অন্য রকম ব্যবস্থা, সেটা বদ্ধ অবস্থার দাস্য, নিত্য সেবা নয়। বাড়ীর মধ্যে, গ্রামের জাতিবিশেষের মধ্যে, কালবিশেষের মধ্যে পরার্থিতায় (altruistic idea) আমাদের অনেক সময় কেটে যায়। ক্ষুদ্র বস্তুর উপাসনা করতে গিয়ে তাতেই মসগুল বা নেশাখোর হয়ে যাই, তামাক-মদ্য-সুপারী প্রভৃতির চাতরে পড়তে হয়। জগতের অভাবগ্রস্ত সব জিনিষই আমাদের আক্রমণ করে। সিংহব্যাঘ্র আমাদের মাংস খেতে ব্যস্ত

হয়, কামক্রোধাদি রিপুষটক্ বিষয় হয়ে আমাদিগকে আক্রমণ করে—রূপ চোখকে টেনে নেয়, সুগীত কানকে টানছে, কেউ প্রশংসা করলে তার সেবা করতে দৌড়াই, আত্মার নিত্যবৃত্তি সেবা সে-রকমের জিনিষ নয়। তা পূর্ণের সেবা, ভোগ্য ভগ্নাংশের নয়। পূর্ণরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবা করলে জানতে পারি—পূর্ণ-জগতের ছায়া এখানে পড়েছে। ছায়ার পেছনে ছুটলে সুবিধা নেই। উহা আলেয়ার (Phantasmagoria) ন্যায়।

গীতা বলেছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।"

মেপে নেওয়া ধর্ম থেকে ছুটি পাব কখন? না, ভগবানের আরাধনা করতে শিখলে। মায়ার প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত না হয়ে—মেপে নেওয়া ধর্ম থেকে ত্রাণ পেয়ে ভগবানকে ভজন করলে দুর্ভোগ বা সুখভোগ হতে অবসর-লাভ ঘটে। জড়ভোগময় ইন্দ্রিয়জধর্মে মেপে নেওয়া বিচার—যেমন জাহাজে চড়ার সময় তিন বাম, তিন হাত প্রভৃতি মাপ করা। আমরা কার কত ইঞ্চি চিত্তের উদারতা, কতটা রজঃসত্ত্ব প্রভৃতি, সর্বক্ষণ মাপছি; এতে যতদিন ব্যস্ত থাকবো, ততদিন জগদ্দর্শন। তখন ভাগবত পড়ি, তখন এটাকে কেন গৌণ বলেছে, তার অনুসন্ধান করি এবং পরমেশ্বর কেন সত্য প্রভৃতি বিচার বুঝতে পারি। সত্ত্বাদি ত্রিসর্গ অসত্য, বিশ্ব পরিবর্তনশীল—বিকারযোগ্য, সচ্চিদানন্দই স্থায়ী। যখন মেপে নিতে যাই, তখন বিশ্বদর্শন, ইহা ভগবানের গৌণভাবে সৃষ্ট ব্যাপার; যখন মাপ দিতে যাই, তখন তিনি যদি আকর্ষণ করেন, তবেই আকর্ষককে কৃষ্ণ জানব, তিনি ভবানীভর্তামাত্র নন অর্থাৎ তিনি ভবানীরচিত জগতের নিয়ামকমাত্র নন,—

"কর্মাণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

কর্মদ্বারা রচিত জগৎসকল—পাতাল হতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সবই পরিণামযুক্ত। চতুর্দশভুবন মুক্তজীবের কোন সুবিধা দিতে পারে না। যেখানে গুণত্রয়ের

সাম্যবাদ—বিরজা, সেখানেও কোনও সেব্যবস্তুপ্রাপ্তিজনিত সুবিধা পাই না, সেখানে ভোগসমাপ্তি মাত্র। নির্বিশেষধাম ব্রহ্মলোকে tabularasa, সেখানেও উপাস্য অধোক্ষজ উরুক্রম নেই। পরব্যোমে সেব্যবস্তু পেয়ে থাকি, সেখানে নাভি থেকে মাথা পর্যন্ত উত্তমাঙ্গদ্বারা পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা, নিম্নাঙ্গগুলো নিজ অকিঞ্চিৎকর কার্যে রেখে পূজ্যবুদ্ধিতে সেবা হয়ে থাকে। পরমেশ্বর এরূপ 'অর্ধকুক্কুটী জরতী' ন্যায়ের মত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বিচারকের সেব্য মাত্র নন। যেখানে বিশ্রম্ভবিচারে বাৎসল্যমধুরাদি ভাবে সেবা নেই, সেখানে প্রবিষ্ট হতে গেলে অতি নিম্নস্তরের আংশিক হরিভক্তি গ্রহণ করা হল মাত্র।

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্।।"

এসব অতি নিম্নস্তরের বিচার। শ্রীনাথ, শ্রীজানকীনাথ, শ্রীগোপীনাথের বিচার যখন ক্রমে ক্রমে জানতে পারব, 'অন্বয়াদিতরতঃ' বিচার যে পরিমাণে বুঝতে পারব, সেই পরিমাণে Positivism—বাস্তবতা আসবে, মনের মলিনতা দূর হবে। বাস্তব সত্যের বিচার গ্রহণ করবার যোগ্যতা হলে অখিলরসামৃতমূর্তি—দ্বাদশরসের পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রকে সেব্যবস্তু বলে জানতে পারব।

সপ্তম দিবস

(২৪ শে আগষ্ট ১৯৩৫, শনিবার)

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।"

আমরা সেই পরমেশ্বর বস্তুর ধ্যান করি, যিনি বাস্তব সত্য, যিনি স্বীয় ধাম---কিরণ-দ্বারা সর্বদা বদ্ধজীবের বাসনাকুহকসমূহ নিরাস করেন। সেই পরমসত্য পরমেশ্বরকে আমরা সকলে ধ্যান করি---একথা যিনি বলছেন, তিনি সম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব। সকল অনুগমণ্ডলীর সহিত তিনি ধ্যান করতে প্রস্তুত হয়েছেন, একা নন। 'ধ্যেয়' বস্তুটিতে উদ্দিষ্টপদার্থের বহুত্ব নেই, একবস্তুই উদ্দিষ্ট হয়েছে; ধ্যানকারী বহু। সকল প্রকার আবরণ নিরাকৃত হলে সর্বদা ধ্যানের সম্ভাবনা হয়। 'ধ্যান' শব্দে সবশুদ্ধ কোন একটী ক্ষণভঙ্গুর সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যান নয়, পরমেশ্বরের ধ্যান। পরমেশ্বরের ধ্যান আর তাঁর অধীন বশ্যবস্তুর ধ্যানে ভেদ আছে। বৈকুণ্ঠবস্তুর ধ্যান সীমাবিশিষ্ট বস্তুর ধ্যানের ন্যায় নয়, এগুলি ভোগ্য, আর তিনি সেব্যপদার্থ। সর্বেন্দ্রিয়-দ্বারা পূর্ণভাবে সেবা করার বিচার ধ্যানে আছে। ধ্যাননিষ্ঠা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে বহির্জগতের অধিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হলে উহা বিপর্যস্ত হয়। ধ্যান পূর্ণবস্তুর হওয়া দরকার, যেখানে ধ্যেয় বস্তুর অপূর্ণতা আছে, সেখানে ধ্যানেরও অপূর্ণতা। সেইটাকে পূরণ করার জন্য যজ্ঞ ও অর্চন-বিধি। কিন্তু কীর্তনমুখে ধ্যানের পরিপূর্ণতা হয়ে থাকে। সেই ধ্যেয়বস্তু কেবল বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎটুকু মাত্র নয়। জগৎটা নশ্বর আর বৈকুণ্ঠ নিত্য--নিরস্তকুহক সত্যবস্তু। ধর্মার্থকামমোক্ষাধিকারী ধাম প্রকাশিত না হলে ধ্যানের পূর্ণতা হয় না, আংশিক স্মৃতিমাত্র উদিত হয়। ধ্যেয়বস্তুটি---পরমেশ্বর। 'পরমেশ্বর' বলতে গেলে শক্তিপরিণত ত্রিগুণান্তর্গত ভোগ্য জগৎ বা জগতের প্রভুমাত্র জ্ঞানটীতে আবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। তাহলে জগন্নাথবস্তু পরমেশ্বর হতে

পৃথক হয়ে যান। জীবের মলিন ধারণায় যে জ্ঞান, তা অপূর্ণ ধর্মযুক্ত। সেইজন্য সম্বন্ধজ্ঞানবিচারে জন্মস্থিতি-ভঙ্গ ব্যাপার যাঁ হতে অন্বয় ও ব্যতিরেক ক্রমে গৃহীত হয়, কেবলমাত্র সেই শক্তির পরিচয়টুকু নয়; ইহা গৌণীশক্তি। যেখানে চেতনজগতের প্রাকট্য, নিত্যত্ব, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, সেই আনন্দরসধাম---বিচিত্রতাযুক্ত লীলাময়ের ধাম ইহজগতের বিচারদ্বারা বোধগম্য নন। মানব-জ্ঞানের বিচারে উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্তমান। অল্প হতে বৃহৎ এর দিকে ধাবমান হবার বিচারমাত্র আছে; কিন্তু যিনি নিজশক্তি দ্বারা বৃহৎকে আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতায় পরিণত করতে পারেন, তাঁর কথা জগতের লোক জানে না। বড়টাকে সঙ্কোচ করে মাধ্যমিকতায় অবস্থান করার শক্তি তাঁর আছে। জাগতিক বিচারে শ্রেষ্ঠতার অভাব হবে বিচার করে যাঁরা ভগবানের তাদৃশ শক্তি অস্বীকার করেন, তাঁরা ভগবানকে অবজ্ঞা করেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরম ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।"

যে সকল জড়রস কাব্যশাস্ত্রে বর্ণিত, তিনি তার গম্যপদার্থমাত্র হলে আমাদের গ্রাহ্যবস্তু হয়ে যান; কিন্তু তিনি ভূমা, অধোক্ষজ হলেও সেই ধর্মের সুবৃহত্বকে সঙ্কোচ করার শক্তি তাঁর আছে। সেই মাধুর্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্মত্ব বা পরমাত্মার ব্যাপকতা বড় জিনিষ নয়। ঐশ্বর্যের বৃহত্ব তাঁতে মলিনতা লাভ করে, তিনি এমন মাধুর্যময় বস্তু। 'ঈশ্বর' শব্দে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি বুঝালে 'পরমেশ্বর' শব্দে কৃষ্ণকে বুঝায়। ভগবান অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁরই রচিত এই বিশ্ব, এতদ্ব্যতীত আর কোন জগৎ নেই, এরূপ মানব-ধারণায় খণ্ডধর্ম বা অসম্পূর্ণতা বর্তমান। বিচারে মূঢ়তাহেতু 'পরংভাব' জানার যেখানে অভাব লক্ষিত হচ্ছে, সেখানে জড়তাকে আশ্রয় করে মিশ্র-চেতনধর্মে অবস্থান। গৌণীশক্তি---মায়াশক্তি পরিণত জগতের প্রাধান্য অস্বীকৃত হয়ে বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতার প্রাধান্য-জ্ঞাপন সম্বন্ধজ্ঞানের পরিচয়ে আদিশ্লোকে লক্ষ্য করি।

'বিশ্ব' বলে যে জিনিষ, মানব যার ভোক্তা অভিমান করছেন সেটুকু তাঁ হতে উদিত, তাঁতে অবস্থিত এবং কিছুদিন পরে নশ্বরতা-ধর্মবশে পরিবর্তিত বা নষ্ট হয়ে যায়।

এটা কর্মভূমিকা, কর্মের প্রাধান্য ইহজগতের ব্যক্তিমাত্রেই বিচার করেন। কর্ম অপেক্ষা নৈষ্কর্ম্যবাদ উচ্চ, আর্থিক সম্প্রদায়ের মহত্ত্ব জ্ঞানের উচ্চসীমায় নয়, পারমার্থিকগণের বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা কর্মের নশ্বরতা অবগত আছেন।

কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।

লৌকিক ইন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণনাসাজিহ্বাত্বগ্ দ্বারা যেটি নির্ণয় করে, তদ্দ্বারা আমরা কর্মের কর্তা-বিচারে সুখ-দুঃখ অনুভব করি। তাতে দুঃখবর্জন ও সুখ আবাহন করার দরকার হয়। সুখানুভূতি কিরূপে হয়? তজ্জন্য জ্ঞানলাভের বাসনায় বৃহত্ত্বধর্ম সংশ্লিষ্ট। ঐশ্বর্যজ্ঞাপক বৃহত্বের বিচার অপেক্ষা মাধুর্যই শ্রেষ্ঠ। হ্লাদিনীশক্তির পূর্ণবিকাশ-লাভের প্রয়োজনীয়তাকেই মাধুর্য বলে। হ্লাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যে যৎসামান্যরূপে আছে। 'আমি ভোক্তা' এই বিচারে যে আনন্দসংগ্রহ-পিপাসা আমাতে আসে, সেটা হ্লাদিনীশক্তি ন্যূনাধিক বিপন্ন হলে হয়; কিন্তু যাঁর হ্লাদিনী, তাঁর সংযোগে সেবা-বৈচিত্র্যেই হ্লাদিনীর পূর্ণবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

মেপে নেওয়া ধর্ম জড়জগতে সংশ্লিষ্ট, তা হতে উদ্ধার পাওয়া চাই। 'আমরা ভোক্তা, জগৎ ভোগ্য'—এই বিচারে পরবঞ্চনা অবস্থিত। অন্যের ভোগ আমার দিকে আসুক—এইটিই পরবঞ্চনা। পূর্ণ ভোগগ্রহণ-ক্ষমতা বাস্তববস্তুতে আছে। তাঁতেই সকল বস্তু গিয়ে পৌঁছুক,—এই বিচার হলে 'আমি ভোক্তা' এরূপ অভিমান দূর হয়। আমাদের পরীক্ষার জন্য—মঙ্গলের জন্য বিশ্বদর্শন। 'আমি ভোক্তা নই'—এ বিচার পশুরা করতে পারে না, শুদ্ধভক্তি থাকলে মানবই করতে পারে। অন্যান্য লক্ষ লক্ষ জীব পরমেশ্বরের ধ্যানের অভাবে ন্যূনাধিক পশুধর্মবিশিষ্ট। তারা পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে অসমর্থতার কারণ যা, তাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কিন্তু পরম করুণাময় বিগ্রহের হ্লাদিনীর কৃপা হলে মাধুর্য-মূর্তির পরম পরাকাষ্ঠা উপলব্ধির বিষয় হয়। এ জন্য 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন, তাতে জানি যে, তিনি পরম করুণাবশতঃ স্বভক্তিশোভা বিতরণ করেছেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করে মঙ্গলবিধান করুন। সেই

মঙ্গলটি কর্মপথ বা কর্মবন্ধ মাত্র নহে। কর্মের পরিণাম আছে। কর্মে লভ্য বস্তু পরিণাম-ধর্মবিশিষ্ট, তাকে রক্ষা করতে পারি না, চলে যায়। কিন্তু আমরা স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরে তার ফলভোগ করতে বাধ্য হই। পরবঞ্চনা-দ্বারা স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ, ব্রহ্মে বিলীন হওয়া, পরমাত্মায় কৈবল্য লাভ করা—এই সকল সংকীর্ণ চেষ্টা হতে শ্রীচৈতন্যদেব মানবজাতিকে পরিষ্কৃত, নির্মল ও উন্নত করেছেন—ভাগবতের ব্যাখ্যা করে।

বিশুদ্ধ হ্লাদিনীশক্তিতে যে লীলার কথা, তা জগতে মেপে নেওয়া ধর্মযুক্ত লোকের ধারণায় কদর্যাকারে পরিণত হয়েছে। নিজভোগজনিত কদর্যতা আছে দেখে তারা পরমপবিত্র পূর্ণতম কৃষ্ণলীলায়ও কদর্যতার আশঙ্কা করে। এমন কি, ভাগবতে তারা শ্রীরাধিকার নাম পর্যন্ত দেখতে পায় না। বাসনার দাস, কামুক, ঘৃণিত জীব কৃষ্ণের নিকট যেতে পারে না বা তাদের কৃষ্ণসেবার যোগ্যতা হয় না। তারা মনে করে, কৃষ্ণকে বঞ্চনা করে ভোগ করব, কিন্তু ভোগ করতে পারে না। ছায়াতে বস্তু-ভ্রান্তি করে যে কর্ম বা নৈষ্কর্ম্য—জ্ঞানচেষ্টা, তাতে মঙ্গল হয় না। বুদ্ধিমান লোক এরূপ বিপদে পড়েন না। জ্ঞেয়পদার্থ বিশ্ব, বিশ্ব জ্ঞাতা বা বিশ্বই জ্ঞান—এই সংকীর্ণ ধারণায় যারা আবদ্ধ, তাদের জন্য বলেছেন, এটা বৈকুণ্ঠধামের ছায়ামাত্র। বৈকুণ্ঠের ছায়া-প্রতিফলিত জগতে ভগবৎসেবা-বিমুখতাবশতঃ জীব অনিত্য ভোগ-ধর্মে অবস্থিত। তাতে মঙ্গল নেই। বৈকুণ্ঠ-সহ জগতের সৌসাদৃশ্য থাকলেও সেখানে নিত্যধর্ম, এখানে অনিত্যতা—তাৎকালিক বর্তমানতা মাত্র। অসংখ্য দর্শনশাস্ত্রে কপটতা বা অবিবেচনার কারণবশতঃ মুগ্ধ হওয়ায় ভগবানের পরমভাব বুঝতে পারে না। তারা বিমূঢ় জানতে হবে। এই মূঢ়তা অপসারিত করে সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদান-জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অবতারণা।

ব্যতিরেকভাব কি? অবরতা, নশ্বরতা, অনুপাদেয়তা কর্মাগ্রহিতা, পরিচ্ছেদ-জন্য অমঙ্গল প্রভৃতি। এগুলি এখানে আছে, এগুলিকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে না। মূঢ় মায়াবাদিগণ ভগবদ্বস্তুই মহেশ্বর, এটা জানে না বলে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রের এমন ব্যাখ্যা করে যে, জগতের বিচিত্রতারই জন্মদাতা, রক্ষাকর্তা ও বিনাশকর্তা তিনি এবং সেইরূপ ধারণায় বিষ্ণুতত্ত্বকে নিম্নস্তরে স্থাপন করে।

কিন্তু সেই মতবাদ ধ্বংস করবার জন্য—নির্বিশেষবাদকে নিরাস করবার জন্য ভাগবতে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' শ্লোকের অবতারণা। বৈকুণ্ঠ হতে অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য এতে (এই বিশ্বে) এসেছে। আর উহার বৈকুণ্ঠের বিপরীত ধর্ম 'ইতরতঃ' এতে, আছে। এখানে দুঃখ, চেতনাভাব, মূর্খতা প্রভৃতি আছে। এখানকার ভোগময়ী চেষ্টায় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সাহায্যে অবগত হই, মূর্খ না থেকে পণ্ডিত—সব বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে যাই, ভগবৎ সেবাবিমুখের ভেতর থেকে এরূপ প্ররোচনা হয়। ভগবানের সৃষ্টিহিসাবে এখানে যে বিচিত্রতা, তার মূল—নিত্য জন্মস্থান বৈকুণ্ঠে, সেখানে বিচিত্রতা পূর্ণভাবে বর্তমান। তাঁতে অজ ও অনজ-ধর্ম যুগপৎ বর্তমান। নির্বিশেষবিচারে তাঁর উরুক্রমত্ব, অধোক্ষজত্ব ধ্বংস করে নাস্তিকতার প্রকার-ভেদকে ধর্ম বলে চালাবার চেষ্টা, মেপে নেওয়া ধর্মের অবরতা তাঁতে আরোপ করব, এরূপ ধৃষ্টতা ভক্তিবিরোধী মনুষ্যের এসেছে। সেখান হতে এখানের তফাৎ কি? সেখানে সচ্চিদানন্দ-ধর্ম বর্তমান; সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনীর নিত্য প্রাকট্য। এখানে পরিণাম—বিকারযুক্ত ধর্ম গুণত্রয়ের অধীন, সুতরাং এটা 'ইতরতঃ' জাত। সেখানে বিনাশ-ধর্ম, অবরতা প্রভৃতি দোষের আরোপ নেই। সেখানকার সবই নির্দোষ, এখানকার বিচিত্রতা দোষযুক্ত।

"অর্থেষ্বভিজ্ঞঃ"—'অর্থ' শব্দে বিষয়। অর্থীর বিষয়কে 'অর্থ' বলে। 'অর্থেষু' বহুবচনের পদ। আমরা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের কাঙ্গাল বলে সমগ্র অর্থে অভিজ্ঞতা হয় না; কিন্তু তিনি সকল প্রয়োজনেই অভিজ্ঞ—সর্বতোভাবে জ্ঞাতা। আমি কামক্রোধের দাস, অনভিজ্ঞ। আর তিনি কালক্ষোভ্য বিকারী অপূর্ণ জগতের জ্ঞানে মাত্র আমার মত পণ্ডিত নন। সেখানে কেবল উপাদেয়তা আছে, অবরতা বা ঘৃণার বস্তু নেই। বৈকুণ্ঠে বিচিত্রতায় তিনি অভিজ্ঞ, তিনিই মূল জ্ঞাতা, সাক্ষী, কেবল, নির্গুণ ও চেতা। আমরা অনভিজ্ঞ, ভ্রান্ত, বিবর্তবাদী হয়ে অহংগ্রহোপাসক হয়ে যাই। সে রূপ বিচারে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। আমি সেই বস্তু নই, সেই জাতীয় বস্তু; অণুসচ্চিদানন্দ আমরা, অণুতানিবন্ধন আমাদের আধ্যক্ষিকতা; বদ্ধ ও বিমুক্ত হবার যোগ্যতা আমাদের আছে। জীবের মঙ্গল তিনি করেন। যার মঙ্গল করেন, তাকে এজগতের বাহাদুরীর মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না।

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।"

জগৎটা স্বপ্নের মত। ধন-সংগ্রহ, স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দেহ—এই দুইটাই ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে, সূক্ষ্ম শরীরসহ মাত্র সংস্কার সঙ্গে যায়, স্থূলভাবে বিষয় যায় না। পুনরায় সংস্কার-বশে স্থূলজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হয়, তাতে নানারকম অসুবিধা। পরমেশ্বর-বস্তুকে ক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে 'সম' মনে করা উচিত নয়। ভাগবতালোচনাকারিগণ জানেন,—জীব সেবকতত্ত্ব, সেব্য নহেন; মুক্তসেব্য ভগবান কেবল সেব্য; তিনি সেবক নহেন। মুক্ত সেবক ও মুক্ত সেব্য মধ্যে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন প্রেমা বর্তমান। পশুপক্ষীর প্রেম, জগতের বাৎসল্যপ্রেম, দাম্পত্যপ্রেমকে 'প্রেম' বলে ভ্রান্তি হচ্ছে। কিন্তু ছায়াকে বস্তুর নিকটে নিয়ে যাওয়া অজ্ঞতামাত্র। উহা **nescience**—অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তি-চেষ্টা। মানুষ জাগতিক জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্বে অবস্থিত হয়ে অজ্ঞেয়তা, সন্দেহ, নাস্তিক্যবাদে অবস্থিত রয়েছে। বাস্তব-বস্তুজ্ঞানের মহাদুর্ভিক্ষ; তাঁর সম্বন্ধে কেউ আলোচনা করে না বলে দেহের সঙ্গে ভোগ্য জগতের সম্বন্ধ আলোচনার বিষয় হয়, সেটা কর্ম, ভক্তি বিপরীত। 'কর্মণাং পরিণামিত্বা-দাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।' ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা—জগৎসৃষ্টির ভার যাঁর—যিনি বদ্ধভাবাপন্ন জীবের মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদির চেহারা কালোচিতরূপে নির্মাণ করে দিচ্ছেন, সেই ব্রহ্মার নিজলোকও অমঙ্গলপূর্ণ। সেটাও অপূর্ণ। শিবলোক—ধ্বংসকারকের অধিষ্ঠানও ঐ-প্রকার। তাঁর বাস্তবিক ধ্বংস—**impersonalface** করার যোগ্যতা থাকলে ব্রহ্মাণ্ড বলে কোন জিনিষ থাকত না। জগন্মিথ্যাত্ববাদীরা বলেন, জগৎ সৃষ্টি হয় নি, **objective existence** নেই। এটা অজ্ঞান-দ্বারা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় ব্যাপার। কিন্তু ভাগবত বলেন—'বিপশ্চিৎ নশ্যরং পশ্যেৎ।' দৃষ্টের ন্যায়—ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের ন্যায় অদৃষ্ট—(কিছু নাই বলে যাকে বিচার করা হয়), সেটাও দৃষ্টের ন্যায় পরিবর্তনশীল। কর্মবাদ ত্যাগ করলে, নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি হলে নিত্যপূর্ণজ্ঞান—হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের ক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হয়।

তিনি "স্বৈনৈব রাজতে" Self-effulgent—স্বরাট্‌পুরুষ। অন্যের দ্বারা আলোকিত হন না। আমাদের চক্ষু থাকলেও—দর্শনের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আলো না থাকলে দেখতে পাই না; কিন্তু সেই জিনিষ স্বতঃ প্রতিভাত। উপনিষদ্ বলেন—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

তিনি নিত্যপ্রকটলীলাময়। সূর্য খানিকক্ষণের জন্য উঠে, আবার খানিকক্ষণ পরে দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়। জড়-সূর্য সেখানে নেই। সেখানে এরূপ চন্দ্রতারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি নেই। তাঁর প্রকাশে সকলের প্রকাশ। সেখান হতে আলোক এসেছে বলে সূর্য পেয়েছেন। ইহ জগতে তাঁরই আলোক সূর্যের দ্বারা প্রতিফলিত; আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্রিয়াবিশিষ্ট হয় তাঁ হতে।

তিনি স্বরাট্—অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করেন না। তাঁকে পেতে হলে যে ভক্তি, সে ভক্তিদেবীও অন্যের সাহায্য—অন্যাভিলাষ-কর্ম-জ্ঞান- যোগাদির অপেক্ষা করেন না। সৎকর্মদ্বারা ভক্তি হতে পারে না। জাগতিক জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানে ভক্তিলাভ হয় না। ওসব ভক্তের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ-
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।

—এই বিচার হওয়া উচিত। ভক্তের নিকট সব জিনিষ আপনা থেকে এসে যায়। "জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।"

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে"—আদিকবি ব্রহ্মার কবিত্ব অনুসারে এই জগৎ রচিত হয়েছে। তাঁর হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করেছেন। 'বেদ' অর্থাৎ

অভিজ্ঞান—মাধুর্যবিগ্রহ কৃষ্ণ, ঐশ্বর্যবিগ্রহ নারায়ণ, বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, সঙ্কর্ষণ হতে প্রকটিত নারায়ণতা—কারণাদিপুরুষাবতারত্রয়ের অভিজ্ঞান যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বিন্যাস করেছেন অর্থাৎ ভাগবতের কথা জানিয়েছেন। যখন ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয় নি, তখন জানিয়েছেন।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।

—প্রভৃতি শ্লোকে বাস্তববিজ্ঞান জানিয়েছেন। ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা, জগতের সৃষ্টিকর্তা; রক্ষাকর্তা—বিষ্ণু, রুদ্র—বিনাশকর্তা। ত্রিবিধ বিচার তাঁতেই অবস্থিত।

"মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ"—সূরিগণ—মহাপণ্ডিতগণ যৎ যস্মিন্—যাঁতে (oblative ৭মী) মূঢ়তা লাভ করেন। আধারবিচারে ভূর্ভুবঃ-স্বঃ—ব্যাহৃতিত্রয় পর্যন্ত যেয়ে আটকে থাকেন। শক্তির পরিচয়-বিচারে অসম্পূর্ণতা লাভ করেন।

'লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্' অজানত মূঢ়স্য বিজ্ঞানার্থম্ —অজ্ঞান লোককে জ্ঞানপ্রদানের জন্য বিদ্বান বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। এটা তাঁরই উক্তি। তিনি বলছেন, এস সকলে ধ্যান করি। মুখ্যগুণ-বিশিষ্টবিগ্রহ যিনি, যাঁর গৌণগুণে জগৎ রচিত হয়েছে—তাঁর ধ্যান করি। তিনি মূঢ়দের মোহন জন্য রাজসতামস পুরাণাদি করেছেন। ভাগবত ব্যতীত অপর পুরাণাদিতে বিমোহনের কথা আছে। এটা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।

অশোক, অভয়, নির্মোহ ইচ্ছা করলে ভক্তিকে আশ্রয় করুন---অধোক্ষজে ভক্তি করুন। আর কুকুর, ঘোড়া, ইতর প্রাণী মনুষ্য বা দেবতাগণের সেবা না করে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা করুন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' তিনি সর্বদা প্রস্তুত আছেন, যে কোনভাবে---শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরভাবে তাঁর সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা হলে তিনি তদনুরূপ কৃপা করে থাকেন। সেব্যের সঙ্গে সেবকসংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ সহ তাঁকে লাভ করেন। যাঁরা তদ্বিষয়ে উদাসীন, তাঁরা একাদশী ব্রতাদির নামে পিত্ত বৃদ্ধি করেন। তাঁদের হরিবাসর হয় না। হরিকে লাভ করতে হলে হরিকথা আলোচনা করা দরকার। বদ্ধজীব জড়জগতে এসে সঙ্কোচধর্মে অবস্থিত। তাদের যে বিচারপ্রণালী, তাতে তারা কাম, ক্রোধাদি নক্র-মকরের দ্বারা কবলীকৃত হয়ে পড়ে আছে। তা হতে উদ্ধার চাইলে ভগবানকে আশ্রয় করতে হবে। সেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি পরিচয়, সেই সম্বন্ধজ্ঞানটিই প্রথম শ্লোকে প্রদত্ত হয়েছে।

আমরা সব সময় কৃষ্ণ ভুলে আছি। যিনি কৃপা করে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করতে আসেন, তাঁকে আড়াল করে কপটতা, প্রতারণা, কর্মাগ্রহিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। সবজান্তাদের বিশ্বাস--আমি জ্ঞাতা, জ্ঞেয়পদার্থ ঠিক করে ফেলেছি, আমার জ্ঞানে ভুল নেই। মূর্খ যারা, বিমুখ যারা, ভগবজ্জ্ঞান যাদের হয় নি, তাদের সেবা-প্রবৃত্তি আসে না। তারা সেব্য অভিমান করে অর্থসংগ্রহ, কামিনী-সেবা ও প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের জন্য চৌদ্দভুবন আলোড়িত করছে। নিজভোগ-সংগ্রহই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ভাগবত এদের নরপশু বলেছেন।

কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বন্ধ করে---হৃষীকেশের সেবা বন্ধ করে, হৃষীকেশের দ্বারা আমি ভোগ করব এই বুদ্ধি যার সে নিজের মঙ্গল চাচ্ছে না। কপালপোড়া পশুবুদ্ধি আমাদের ভাগবত শুনবার প্রবৃত্তি নেই। তাঁর বিরোধ করে নিজের মূর্খতা বৃদ্ধি করব। এটাই আমাদের ভাগবতপাঠ। ভোগে নরকপ্রাপ্তি বা ত্রিবিধ ক্লেশের বশীভূত থাকামাত্র লাভ। সেবাপরায়ণ হওয়া চাই। সেবা-চেষ্টাকে ধ্বংস করে গুণজাত জগতের বিচার-বৈক্লব্যের জন্য যত্ন করা কর্তব্য নয়। বাস্তব বস্তুর দর্শনাভাবেই ভোগের দুষ্প্রবৃত্তি। অভিধেয় বিচারের সময়----'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে এ সব বিষয় ভাল করে আলোচিত হবে।

ধর্মবিচারেও বিবর্ত হয়েছে। কেউ বলেন স্বাধ্যায়, কেউ বলেন তীর্থযাত্রা ইত্যাদি, কিন্তু সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। কৃষ্ণপাদপদ্মের ভজন করলেই সর্বসিদ্ধি করতলগত হয়। এখানে বিবর্তজ্ঞান---মায়ারচিত ইতর জ্ঞান ও শুষ্কজ্ঞান উভয় প্রকারের যোগ্যতাই আছে।

অনেকের 'কমঠ'-ন্যায়ে এখানে আহার্য সংগ্রহ করে। Analogyকে বড় বিচার করলে জগৎটাই আছে ধারণা হয়। কিন্তু জগতের প্রভু পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় না। জগন্নাথ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অন্যদেবতা কল্পনা করলে ভ্রান্তিহেতু অমঙ্গল হয়।

অনেকের ভ্রান্তি হয়, গৌড়ীয়মঠ গোস্বামি-শাস্ত্র বা ভাগবতের কথা আবরণ করে অন্য কথা বলেন, আর প্রাকৃতসহজিয়ারাই সে সকল কথার আলোচনায় নিযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি, গলায় মালা দিয়ে নিজসজ্জায় কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশার জন্য ঘুরে বেড়ান ভাগবতপাঠের ফল নয়। তাদের এরূপ ভাগবতপাঠ বন্ধ করা দরকার।

১৯০৪ সালে নীলাচলে চৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলাম। বহুলোক শুনতে আসতেন, কিন্তু অনেকেই আমার কথা ধরতে পারলেন না। যারা খাওয়া দাওয়া থাকাতেই ব্যস্ত, তারা বৈষ্ণবতা হতে শত সহস্রযোজন দূরে। এদের সঙ্গে আমাদের কোন প্রতিযোগিতা নেই। আমরা কৃষ্ণ-বিমুখের সঙ্গ হতে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত। ভাগবত শ্রবণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। সমর্পিতাত্ম ব্যক্তির নিকটই ভাগবত কীর্তন করতে হবে। তবে যারা দুঃখে পড়ে আছে তাদের উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজকাল তাতেও বিপদ। দুই পক্ষে ঝগড়া চলছে। তৃতীয়পক্ষ তাদের ঝগড়া মিটাতে গেলে লাঠিটা তারই ঘাড়ে পড়ে। জলে ডোবা লোককে যে উদ্ধার করতে যাবে, তাকেই চেপে ধরে জলমগ্ন ব্যক্তি ডুবিয়ে দিতে চায়। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।" বিদ্বেষীকে **incorrigible** জেনে দূরে রাখতে হবে। অশ্রদ্ধধানে হরিনাম দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাদৃশ জনগণ গুরুর কাছে হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করে বিপথগামী হচ্ছে। গুরুও বলছে যা ইচ্ছা কর, বার্ষিকটা দিও। কিন্তু অপরাধযুক্ত হলে হরিনাম

হয় না। "মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ" বিচার না করে যার যার গুরু তার তার কাছে, শয়তানের গুরু, চুরি করার গুরু হলে চলবে না। ঠাকুর ঘরে পূজা করবার জন্য কেউ যায়, আবার কেউ বা চুরি করার জন্যও ঠাকুরঘরে ঢোকে—এ রকম ভাগ্যহীনতার কথাও অনেক শুনতে পাই। ঠাকুর মহাশয় গেয়েছেন—'অসত্যেরে সত্য করি মানি বা অধনে যতন করি' ধন 'তেয়াগিনু'—এগুলি গল্পের কথা নয় বা সুর মান লয় লাগাবার জন্য নয়, হরিসেবার যোগ্যতা লাভ করবার জন্য। নিজের বাহাদুরী করে জগতের জীবকে বঞ্চনা করব বা আত্মবঞ্চনা করব এটা ভাল নয়। গুণজাত পদার্থকে বহুমানন করলে বিফলমনোরথ হতে হয়। শুদ্ধনামাশ্রিত হলে বিশ্বদর্শন ভূয়ো হয়ে যায়। নামাভাস, নামাপরাধ বর্জন করে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে শুদ্ধ নামাশ্রয় করাই কর্তব্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্‌ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।।

[একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করবে।]

সবশুদ্ধ বিশ্বকেই একমাত্র বস্তু বিচার করলে 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' থাকতে হবে। লীলাময়ের লীলা পরমসত্য, পূর্ণজ্ঞানময়। নিরানন্দ সেখান থেকে লক্ষ কোটী যোজন দূরে অবস্থিত। সেখানে নিত্য নবনবায়মান আনন্দ বিরাজমান। সেখানে পৌঁছান দরকার। সেই পরমেশ্বর বস্তু সাক্ষাৎ আমাদের সম্মুখে রয়েছেন। (শ্রীবিগ্রহের প্রতি নির্দেশ করে) এঁকে বদ্ধজীবভোগ্য কাঠ-মাটিপাথর বিচার করবেন না। হৃদয় নির্মল হলে দেখবেন সেই বস্তু ভোগ্য পিণ্ডমাত্র নন—পরমবাস্তব সত্য। বাস্তব ভূতশুদ্ধি সেই সময়েই হবে।

অষ্টম দিবস

(২৬ শে আগষ্ট ১৯৩৫, সোমবার)

"ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
ত্যক্ত্বাসুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্‌-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।"

হে মহাপুরুষ, তুমি দেবতাদিগের কাম্য ভোগ্য সুদুস্ত্যজ রাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করে আর্যশ্রুতিবাক্যানুসারে মায়াবাদ পরিহার পূর্বক পরমধর্মাশ্রয়ে বিশেষতঃ কান্তাগণের কান্তের প্রতি সেবাসৌষ্ঠব-বিধানভূমি বৃন্দারণ্যাশ্রয় করে যা শিক্ষা দিয়েছিলে, সেই লীলানুগত্যে তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করি। ভগবদ্‌বস্তু মহাপুরুষ সর্বদাই তাঁর সেবকগণের দ্বারা সেবিত হন। তিনি পরমেশ্বর-বস্তু হওয়ায় বশ্য ও ঈশ্বর-সম্প্রদায় তাঁকে নিত্য সেবা করে থাকেন। তা হলেও তিনি তা পরিত্যাগ করে প্রিয়ভক্তগণের যে অভীষ্ট—ভজনীয়বস্তুর প্রতি যে বিচার, তার অনুবর্তী হয়ে বিষয়বিগ্রহের লীলারস আস্বাদনের পরিবর্তে আশ্রয়বিগ্রহের আস্বাদ্য রস—যার অনুভূতি বিষয়বিগ্রহ হওয়ায় তাঁর পূর্বে ঘটে নি অর্থাৎ বিষয়বিগ্রহোচিত রসাস্বাদন-পরিহার করে আস্বাদক-সূত্রে আস্বাদ্যরস-বিলাস গ্রহণ করেছেন। তিনি যে ত্যাগটা করেছেন, সেটা কি জিনিষ?—'সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মী'। আর আর্যবাক্যানুসারে মায়াবাদীয় শ্রুতিতে অনুসন্ধান ত্যাগ করেছেন। সুর—দেবতা, তাঁরা অভিলাষ করেন—ভোগ, তাতে স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে—অমরভূমিকায় যে

রাজ্যলক্ষ্মী, তা পরিত্যাগ করে অর্থাৎ ভোগীর চেহারা ও মায়াবাদী মৃগের দ্রুতগতি পরিত্যাগ করে চিদ্‌বিলাসারণ্য---বৃন্দারণ্য আশ্রয় করেছেন। আর তাঁর দয়িতের ঈপ্সিত আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের যে বিষয়জাতীয় আস্বাদন, তাতে অনুধাবন করেছিলেন অর্থাৎ বার্ষভানবী যে বিচার অবলম্বন করে তাঁর কান্তের সেবা করেন, সেই বার্ষভানবীর আনুগত্য-বিচারে মুক্তপুরুষগণ যে প্রকারে কৃষ্ণসেবা করবেন, তার আদর্শরূপে অগ্রসর হয়ে বৃন্দারণ্যে গমনাভিলাষ দেখিয়েছিলেন। কেন না তাঁর বিচার-প্রণালীতে দেখি---

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।

ব্রজবধূবর্গ যেপ্রকার তাঁদের কান্তের উপাসনা করেছেন, সেটি লোকশিক্ষার জন্য তিনি দিয়েছেন। তিনি নিজেই সেই বস্তু হওয়ায় নিজেই নিজেকে আস্বাদন করেছেন। যথা----

অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।।

[কৃষ্ণ বললেন,---আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্বচিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটি কে? ইঁহার প্রতি দৃষ্টি করে আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখছি এবং বলপূর্বক আলিঙ্গন করতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করছি।]

উপরিউক্ত শ্লোকোদ্দিষ্ট বিষয়ে যেপ্রকার ভগবানের রসাস্বাদন-চেষ্টা, সেগুলি গৌরসুন্দরে চরিতার্থতা লাভ করেছে। অতএব সেই মহাপুরুষই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর। অনেকে সীতাপতির পক্ষে এই শেষোক্ত শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এই সকল কথায় একটু আবরণ দিয়ে

অন্য প্রকার বিচার করার ব্যবস্থাও করে থাকেন। সুতরাং আমাদের মৃগ্য---ধ্যেয় পদার্থ সেই পরমেশ্বর। যদিও ভাগবত কৃষ্ণলীলা বর্ণন করতে বসেছেন, পূর্বার্ধ সম্ভোগময়ী লীলার কথা বলেছেন কিন্তু বিপ্রলম্ভময়ী লীলা, যাতে সম্ভোগের পুষ্টিসাধন করে, সেই পরম প্রয়োজনীয় বিষয়টি গৌরসুন্দর প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং গৌরসুন্দর-প্রচারিত যে ভাগবতের বিচার-প্রণালী সেটিই আমাদের আলোচনার বিষয় হোক। আমরা সম্বন্ধতত্ত্বের আলোচনায় পাই, যথা গৌরসুন্দরের বাক্য---

"বেদশাস্ত্র কহে---সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।"

পাছে সাধারণ জীব বিবর্ত অবলম্বন করে বদ্ধজীবকে মুক্তাবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করে, তার জন্য গৌরসুন্দরকে ভোগবাদ ও মায়াবাদানুসন্ধান ছেড়ে ভক্তির অরণ্য আশ্রয় করতে হয়েছে। তিনি কপটসন্ন্যাসী হয়ে অহংগ্রহোপাসনার---মায়াবাদের উপদেশ দেন নি। মায়ামৃগে যে ঈশ্বরবুদ্ধি---সদানন্দ যোগীন্দ্রের যে সদসদনির্বাচনীয় বিচার, তা থেকে পৃথক (বেদান্তের) ব্যাখ্যা গৌরসুন্দর করেছেন। সাধারণ লোকে মনে করে গৌরসুন্দর ভক্তের বিচার প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেই উপাস্যবস্তু। এরূপ কথায় ভক্তের ভগবত্তালাভ সম্ভব---এরূপ কোন রকম ইঙ্গিত যদি দিতেন, তা হলে মায়াবাদ সমস্ত জগৎকে গ্রাস করে ভ্রমপথে চালিত করত। "আমরা ঈশ্বর, ভোগী, জগৎ আমাদের ভোগ্য, অথবা বৈকুণ্ঠে বিচিত্রবিলাস নেই, বৈকুণ্ঠও মায়ারচিত"---এই দুর্বুদ্ধি হতে তিনি মানবজাতিকে পরিত্রাণ করেছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাশয় ভাগবত-প্রারম্ভে যে শ্লোকটি লিখেছেন, তাতে সম্বন্ধ-জ্ঞানের কথা আছে। আমরা সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করবো। অনেকের আগ্রহও ছিল, সম্বন্ধের কথা প্রচুর পরিমাণে আলোচিত হোক। দশমের ব্যাখ্যা-কালে সে আলোচনা সুষ্ঠুভাবে হবে। সম্বন্ধবিষয়ে বিগত দুই দিবস আলোচনা হয়েছে, আজ অভিধেয়ের কথা আলোচনা হবে। সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়ের কথাও আলোচনা করা প্রয়োজন। অভিধেয় শ্লোকটি এই---

"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।"

যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় করবেন, তিনি প্রহ্লাদোক্ত---

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।"

---এই শ্লোকটির অবলম্বন করবেন। সমস্ত শাস্ত্রশ্রবণের ফলই হচ্ছে জীবের ভক্তিমান হওয়া---অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এজন্য অভিধেয়-বিচারের কথা অসম্প্রসারিত বীজের ন্যায় এই শ্লোকটিতে (ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ শ্লোকে) বীজীভূত আছে। এই সম্প্রসারিত বিচার নয়, ইহা সূত্রাকারে অভিধেয়-বিচার। যেমন প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা স্বল্পকথায় বলেছেন, অভিধেয়ও সেই প্রকারে এই স্থানে কথিত হয়েছে। যাঁরা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হন, তাঁদের সম্বন্ধ-জ্ঞান পূর্ণতা-লাভের পূর্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হয়ে থাকলে অভিধেয়বিচারের সুষ্ঠুতা হয় না। কেবলজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তাতে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হয়ে গেছে। যদিও কর্মকাণ্ডকে তারা অভিধেয়রূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্মবাদ--ফল-কামনা-রাহিত্যই তাঁদের উদ্দেশ্য। তাতে যে ফল-কামনা-রাহিত্য যথেষ্ট আছে, তা সুচতুর ভক্তগণ তাদের নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্মে যে শান্তির প্রয়াস, তা কৃষ্ণভাব বর্জিত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। "যেহেতু জড়জগতে ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাকতে হয়, সুতরাং গুণজাত জগতের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার---ত্রিপুটীবিনাশ করলে---জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার না থাকলে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, আত্মবিনাশ সুষ্ঠুভাবে হতে পারবে" এর নাম মায়াবাদ। মাপতে মাপতে মাপা ছেড়ে দিতে

গিয়ে জ্ঞাতৃত্বধর্ম রহিত হয়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার--- চেতনধর্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতনধর্মের পূর্ণবিকাশ সেই বাস্তববস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাকবে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হয়েছিল, মুক্ত অবস্থায়ই বা কি হবে, তা এরা বুঝতে পারেন না। তাঁদের যে মুক্তির বিচার, সেকথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে---

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।।

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহৃত জ্ঞানের দ্বারা বহির্জগতের বিচার অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অগ্রসর হয়ে তার পরিহারেচ্ছা। পরিশেষে উহাতে কিছুই থাকবে না---এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাকবেন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। সূর্য্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণ-দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতা দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হয়ে জীব হয়ে গেছেন, এরূপ কথা নয়। যেহেতু তা হলে ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়। জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদে যে অজ্ঞতা, যা রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে পরোপাধ্যালীঢ়ং ভ্রমপরিগতং প্রভৃতি মত বর্ণন করেছেন, তাতে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অজ্ঞতা লাভ করেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা থেকে মানবজাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তাদের বুদ্ধি প্রসারিত হোক---তারা ভক্তির

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। "তথা ন তে মাধব" শ্লোক আলোচনা করলে জানতে পারি যে, ভগবান জীব-নিত্যসত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহজগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপাসনা করি, বিঘ্ন বিনষ্ট হলে ভোগেরই পূর্ণতা লাভ হবে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের আনুগত্য করলে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ- চেষ্টাকে বালচাপল্য মাত্র বলে জানা যায়। গণেশের পূজা করলে সিদ্ধি, তাতে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি—জাগতিক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হতে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান লোকের থাকার জায়গা নয় বলে গল্প শুনলে হবে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের উন্নতিকামী হয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তাহলে কি পাব? কনক, কামিনী—না হয় সাধু বলে সম্মান পাব। কিন্তু এই তিনটাই ত' ঘৃণ্য জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্বেই মানুষ সমঝদার হয়ে বুঝতে পারে, এই তিনটিই প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। মোক্ষই বা কি জন্য? তাতে আমারই সুবিধা হোক, অন্যে অসুবিধায় থাক্—এ রকম দুরাশার বশেই মুক্তিপিপাসা হয়। সাযুজ্য ব্যতীত অন্য প্রকারে লোকের মুক্তি হলে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হলে ওর মুস্কিল, এজন্য তাদের মুক্ত করার চেষ্টা নেই। যেমন বাউল সম্প্রদায় ভোগ্য-বস্তু নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে পরিহৃত হয়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য করেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণপাদপদ্মে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা পড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কার প্রতি তা জানা দরকার। গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা; কিন্তু রাধিকার পাল্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হলে কুণ্ডতীরে নিত্যস্থান আছে জানতে পারি। চৈতন্যদেব যে সকল কথা বলেছেন, সেটা ঐস্থলে জানতে পারি। অবশ্য এ সকল কথা ভাগবতে ভাল করে প্রবেশের পরের কথা।

অনেকেই ভাগবতে রাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ ভ্রমে পড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নেই;তার থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। 'যদি ওঁর নামটা পাই, তাহলে সব অধিকার লাভ করেছি, ভাগবত পড়া হয়ে গেছে'—এ রকম দুর্বুদ্ধি আসে। যদি 'অনয়ারাধিতো নূনং' বা রাসস্থলীর তাৎপর্য বোঝা হয়ে থাকে, তাহলে তা পরিপাকের পর জীর্ণ-জাতীয় ত্যাগের বস্তু হয়ে যাবে। যা খাই, তা নির্গত হয়ে যায়, ওগুলো পড়া হয়ে গেলে—'বাজি মেরে দিয়েছি' বিচার হলে কৃষ্ণনিত্যানুশীলন খতম হয়ে যাবে। তা অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল। যেমন **Saccharin** আলকাতরার মত জিনিষ, খুব বেশী মিষ্ট, একেবারে খেতে বিস্বাদ হয়, **dilute** করে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করার দরকার; **Sound**-এর **vibration** অতিরিক্ত বা কম হলে শুনা যায় না, **range** অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ করা দরকার।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্বাহঃ স্বীকুর্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎপূর্বে সংশ্রবণ; তার পর বিচারণপরতা। সর্বক্ষণ স্মৃতিপথে থাকুক এইটিই বিচারণপরতা। তাতে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠনচিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বলতে ভগবান ও তদনুগত ভক্তকে বুঝায়।

এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র।।

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে আসেন, তখন তাঁর পূজা করেন যাঁরা, তাঁরা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই ভাগবতের কীর্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু; তাঁতে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে কীর্তিত হয়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চাবিগ্রহরূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত। এই সূর্যের

উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-মুখেই ভাগবত-সূর্যের পূজা---তাঁর অঙ্ঘ্রিসেবা। পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্তন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের সেই ভাগবতের বর্ণনটাই আদরের বিষয়হোক। কিন্তু এর অধিকারী কে? ''যতছিল নাড়াবুনে সব হল কীর্তনে। কাস্তে ভেঙ্গে গড়াল করতাল''---যদি সকলে মিলে এরূপ হই, তাতে সুবিধা হবে না। অধিকার লাভ করে ভাগবত অধ্যয়ন করতে হবে। তা না হলে বিচার হবে,---ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের করে নেওয়া যাক, তা হলে ভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করতে পারা যাবে! ভাগবত-বিচারসৌষ্ঠব বিকৃত করতে পারলেই সুবিধা! আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। তজ্জন্য ভাগবত বলেন---তাঁর পাঠক সাধু, নির্মৎসর। এতে পরমধর্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্মের কথা নেই। সাধুগণের---মৎসরতাহীন মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ জীবের জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য নন। তাঁরা (কেবলাদ্বৈতবাদিগণ) বলেন---''ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত উপনিষদ পড়া যাক। কারণ ভাগবতশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হয়েতাকে নরকে নিয়ে যাবে।'' কিন্তু যারা ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তা' হলে অজ্ঞতাবশতঃই হোক বা রজস্তমোগুণ-প্রাবল্য-হেতুই হোক এতে যাদের বিরাগ, সেই ভাগবতবিরোধিসম্প্রদায় ঐরূপ বিচার করতে গিয়ে অসৎ পাপিষ্ঠের অন্যতর হয়ে সাংসারিক ভোগ হেতু নরক প্রাপ্ত হয়ে থাকে। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবদ্রসকে নিজ- ভোগবিরোধী জেনে মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্মের নামে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপরতা প্রবল করে বাইরে ধর্মের ভাব দেখালে তাদের স্থান কোথায়?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্মের কথা কথিত হয়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম, তা শিবদ---মঙ্গলপ্রদ, তদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মুলিত হবে---ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হবে, আর বাড়তে পারবে না, একেবারে নামগন্ধ থাকবে না। কিন্তু ধর্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আসবে। ধর্মার্থকামচিন্তায়---ভোগ, সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশন্তি' আর মোক্ষ--সব ছেড়ে দিয়ে

Impersonal হয়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর চিন্তাস্রোত, তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোন প্রতীতি নেই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে বরং তাৎকালিক প্রতীতিও আছে; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নেই। সেটা বাইরের আবরণ ঠিক রেখে শিষ্টভাষাবলে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চনা করব---মৎসর অসাধুব্যক্তিদিগের এই বুদ্ধি হতে জাত।

ভাগবতের ''যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ'', ''শ্রেয়ঃসৃতিং'' এবং ''নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জিতং'' প্রভৃতি শ্লোকে নির্বিশেষবিচারকে অবিবেচকের চিন্তাস্রোত বলেছেন। বেদান্তের ব্যাখ্যাও এরূপ হতে পারে না। সেব্য ঈশ্বরকে নিত্য সেবকের ফল-লাভেচ্ছায় বঞ্চনা করার প্রবৃত্তি হতে ভোগ ও ত্যাগ উৎপন্ন। ভোগে ক্ষণভঙ্গুর লোক-প্রাপ্তি আর মুমুক্ষা কাল্পনিক। জড়ের বস্তুগুলি সব থেমে যাক, এতে আপত্তি নেই, কিন্তু চেতনের বিলাস থামবে, এটা নিতান্ত অল্প মস্তিষ্কের বিচার। তমোগুণে এরূপ বিচার উত্থিত হয়। 'আমি ঈশ্বর হয়ে যাব' এরূপ শ্রুতিবাক্য আছে কিনা, তাকে পরিপোষণ করা যায় কিনা, বিচার হওয়া দরকার ---নিম্নসৃষ্টির ন্যায় মাথাওয়ালা মানুষগুলোর কেন এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়? এটা মৎসরতা-জাত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটি একত্রিত হলে মৎসরতা বা পরশ্রী-কাতরতা আসে। কামের অসিদ্ধিতে ক্রোধ। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর দাস্যে অবস্থিত থাকলে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। ঐগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা থেকে মোক্ষ হলে তারা ভাগবত শুনতে পারবে।

কৈতব শব্দে ছলনা। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন---''প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। 'প্র' শব্দের মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।'' ধর্ম অর্থ কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ বলে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটতা। বুভুক্ষায় 'ফেল কড়ি মাখ তেল'---এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করে পশুমাংস খাবে। খাবে খাক, এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে কার্য সিদ্ধ করার কি দরকার? এ তিনটীতেই যে ছলনা তা নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা---তাতে হবে কি, কৃষ্ণলীলা বন্ধ হবে। উহাতে রুদ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয়

না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর রুদ্রের কাছে বর নিয়েছিল, সে যার মাথায় হাত দেবে সেই ভস্ম হয়ে যাবে। পরিশেষে শিবের নিকটে বর লাভ করে তাঁরই মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার করতে চায় কিন্তু বিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেন। এটা Impersonalism—আত্মবঞ্চনা। তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার কষ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাকব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা। মুমুক্ষার মধ্যে ফল লাভ ইহাই। মুক্তিতে শান্তি ইনিই পাবেন আর ভগবান বাদ যাবেন। এমন করে নিত্যসেব্য বিষ্ণুকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নেই। জপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা করে নেব, ভগবান ধ্বংস হয়ে যাবেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হয়ে যাব, শোকমোহ থাকবে না। কাজটা হাসিল করার জন্যই ভগবান। কাজের সুবিধা হলে ভগবানের দরকার নেই। ভোগবুদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি, ত্যাগ হলে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অকর্মণ্যতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং অন্যান্য আচার্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্মার্থকামমোক্ষে যাদের প্রয়াস, তারা অভক্ত। ভাগবত-শ্রবণ তাদের ভাল লাগে না, পরম ধর্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তাঁরা গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জানতে হবে। চতুর্বর্গের চেষ্টাই শেষ কথা—মনে করা রূপ দুর্বুদ্ধি যতকাল আছে, ততদিন পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম হতে অবসর হবে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তবমিশ্র প্রতীতিতে ভরা। রাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন, রাধাগোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তু-জ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙ্গলে বাস্তব বস্তু জানবে। কে জানবে?---ভক্ত, নির্মৎসর যাঁরা। পরমধর্ম জানলে ফল কামনা থাকবে না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হবেন---এটা ভোগী মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হতে জাত। কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তু (rubbish) মাথায় করছি। বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান লাভ হলে---positive মঙ্গল পেলে Secondary অমঙ্গল 'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া'-বিচার কোথায় চলে যাবে। দার্শনিকগণ বলেন —দুঃখত্রয়বিঘাত জন্যই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। তাতে তাঁদের স্বার্থ

কি? 'ধর্মেণ গমনমূর্দ্ধম্ তদ্‌বিপরীতং ভবত্যধর্মেণ।' কিন্তু তাতে পরম মঙ্গল হবে না।

'কর্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।'

আমি কর্মের কর্তা, কর্ম করে লাভবান হব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত করব। পরমেশ্বর না পাক, শত্রু না পাক, ভাইয়েদেরও দেব না, এই সমস্ত দুর্বুদ্ধি ভোগিসম্প্রদায়ে আছে। তারা মনে করে—ভোগের ব্যাঘাত হলে অসুবিধা হবে।

বেদ্য সম্বিৎ-শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোদাস্তনন্ধয় বালগোপাল বা কিশোর গোপালকে পাওয়া দরকার। তিনি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটি জানা দরকার। বস্তুর বিশেষণ 'বাস্তব' বস্তু---থাকে যাহা। থাকা-ধর্মযুক্ত হয়ে থাকে যাহা, তাহাই বাস্তব। তাহা কাল্পনিক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অসম্যক বা আংশিক ধারণামাত্র নহে। অবিচিন্ত্যশক্তিমান নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদী বহুদূরে পড়ে থাকবে। ভাগবত পড়া হলে, দশম পড়লে, বাস্তববস্তু অনির্দিষ্ট থাকবে না। Abstract থাকবে না। উহা স্বতঃকর্তৃত্বধর্মবিশিষ্ট। নিত্য আপেক্ষিক ধর্ম (relativity) বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

জগতের এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্য নিরূপণে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। কিন্তু মূল বস্তুতে মেপে নেওয়া ধর্ম নেই। যে জিনিষটা থাকে না, তার সঙ্গে মূল বস্তুর কি সম্বন্ধ? তবে পূর্বদিন বলেছি অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তা তদ্‌ভাববিশিষ্ট নয়। যেমন নারায়ণ উপনিষদ পড়ে অশ্ব-নারায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণ প্রভৃতি বিচার করতে গেলে সর্বনাশ হবে। উল্টা বুঝলি রাম। তা হলে পদ্মানীতি হয়ে যায়। 'তেজোবারিমৃদাং' বুঝতে না পেরে ঐন্দ্রজালিকের সম্পাদন মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভুল দেখাচ্ছে বাহ্যদর্শনে (seeming sight); লোকে প্রথমমুখে ভুল দেখছে। পিতার বাৎসল্যের শাসনদণ্ড দেখে অনেকে ভীত হতে পারেন। তাঁরা জানেন না যে, পিতা শাসন করছেন---শিক্ষার জন্য, মঙ্গলের জন্য। কিন্তু পিতার বাৎসল্য প্রচুর পরিমাণে তাতে আছে। শিক্ষিত হলে সন্তানেরই লাভ, পিতার লাভ নেই।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি বলেছেন। পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসদেব উহা শিষ্যপারম্পর্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা করেছেন।

'অপরৈঃ কিম্'—অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। অন্য কথা বলে ফল কি? এতেই সর্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হলে বাজে কথা থাকবে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন'—বিষয়টী বুঝতে পারা যাবে।

সেই জিনিষ আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তাপত্রয়ের উদয় হয় নি—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় নি। সেই সময় ইহা ব্রহ্মা পেয়েছেন। আমাদের সেই বস্তুতে প্রয়োজন নেই। ভগবান্ নয় যেটা, সেটা হৃদয়ে আসছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক আমাদের ভোগের সাহায্য করুক। আমি জগৎ ভোগ করব। বহির্জগতের জিনিষ পেলে আমার সন্তোষ। অন্যের দ্বারা সন্তোষবিধান করিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব। কৃষ্ণের সন্তোষবিধান করার দরকার নেই। এ সকলই সঙ্কীর্ণ পরার্থিতা। উদার পরার্থিতায় উপকার কার করব? যে কৃষ্ণভজন করবে। ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা করব। যাঁরা কৃষ্ণকথা বলেন, তাঁদের সেবা করব। বিরোধী কথায় অন্যমনস্ক হব। ভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়—অভক্ত দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাজ্য। তাদের আক্রমণও করব না, তাদের কোন কথায়ও থাকব না।

কৃষ্ণ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়ে গেলে পলাতে পারবেন না। 'শুশ্রূষুভিঃ কৃতিভিঃ' বলে দুটি শব্দ আছে—যারা খুব সুনিপুণ ও সেবা করেন (শ্রবণ-কীর্তনাত্মিকা সেবা)।

'তৎক্ষণাৎ ও সদ্য' কথাদ্বয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বালক জন্মগ্রহণ করে ক্রমশঃ বড় হয়ে সমাবর্তন করে পুত্র উৎপাদন করবে। তাতে অনেক বিলম্ব। সেরূপ কথা নয়। সদ্য সদ্যই ভগবজ্জ্ঞান ও সেবাধিকার কোন কালবিলম্ব না করে পাওয়া যাবে।

নবম দিবস

(২৭।৮।৩৫, মঙ্গলবার)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

প্রথম শ্লোকটিতে যে প্রণামের কথা বর্ণিত, এটি সম্বন্ধ জ্ঞানবিষয়ে, আর দ্বিতীয়টিতে অভিধেয়বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যাঁরা ব্যস্ত অথবা ত্যাগমুখে মায়াবাদগ্রহণে ব্যস্ত—এই দুই প্রকার বৃত্তি পরিত্যাগ করে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবার বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্যবাক্য অনুসরণ করে যে প্রকার বিষয়বস্তু আস্বাদন করা আবশ্যক, তার আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও রসাস্বাদন করেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।

অভিধেয়বিচারে ভাগবত যে কথাটি বলেছেন—"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" অর্থাৎ কি উপায় অবলম্বন করলে সেই ভগবদ্বস্তু আমাদের লভ্য হয়, বাধাসকল অপসারিত করে, সেই বস্তুর সেবা-লাভ ঘটে, বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞান এবং তজ্জন্য যে ফল-লাভ আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয়ে চতুর্বর্গফলপ্রার্থনা নিরাস করে প্রকৃত প্রস্তাবে নির্মৎসর ও সাধুগণের যে পরমধর্মানুশীলন, সেই কথাটি ভাগবতের এই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হতে পৃথক থাকার যে বিচার, তাতে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হয়ে বিপথগামী হচ্ছি বা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের জন্য যত্ন করছি; তাতে কর্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্মপ্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তাকে বধ করলেন, তখন আমরা মনে করি,— "প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাকবে, কৃষ্ণের অসুবিধা হবে, সেই কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করলে কোনসময় হয়ত অসুর প্রবল হয়ে ব্যাঘাত করে বসবে; তাহলে উপদ্রুত কৃষ্ণ বলবান নহেন।" তাতে বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্তি অর্চাতে স্থাপিত হয়, দেখি—এঁরা কথা কইতে পারে না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি তা সমর্থন করতে পারেন না; তাই বলি—এরকম অর্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চা স্থাপন করি এই সব দ্রব্যাদি দিয়ে; এতে যে চেতনধর্ম আছে, এটি বুঝতে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক, পূতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম থাকলে সবসময় ত' কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। কিন্তু আমরা শুনেছি, যেখানে ভগবান্, সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নেই; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রীতির অভাব—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মন"

ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্য মধ্যে থাকা-কালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তাতে ভগবদ্দর্শন সুদুর্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হচ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম নেই বলে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম থাকলেও বিপ্লব উপস্থিত করবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রবেশ করবে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তাতে বলছেন, নিত্য অপ্রকটলীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি

কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাত কারীর অধিষ্ঠান নেই। এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নেই, সেখানে সেইপ্রকার কংসাদি পুত্তলের আকার আছে, তাদের চেতনধর্ম নেই। শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর-ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেনতামাত্র আছে। ইহজগতে যেমন আমরা অর্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতনধর্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত হলে সে-জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচপ্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচ প্রকার মিশ্র- চেতনধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান করছে। সেখানে শুধু ভগবান্ ও তদাশ্রিত ব্যাপার। যেখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্রচেতনরাজ্য ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্রচেতনরাজ্যে চেতনধর্ম থাকলেও স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করতে পারে না। যেমন ইলেকট্রিক্ পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তার নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র। এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ-চিদচিন্মিশ্রভাব। এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্মভাব সেবাবৈমুখ্যবশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম এখানে আসতে পারে না। আসতে হলে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ করে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা করে থাকে। যেমন দয়া বলে যে শব্দটি, তাতে আমরা আলোচনা করতে পারি, একজন দান করছেন, একজন গ্রহণ করছেন। চিত্তে দয়া বস্তুটির মূর্তি না থাকলেও চিত্তে উদিত ভাবের দ্বারা জানতে পারছি। বহির্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম বিরাজমান। নিত্যবস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়; তাতে অচেতনতা—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্তমানটাই কেবল জানি—বর্তমান নিয়েই বিচার করতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্যকাল আছে; জ্ঞান সংগ্রহ করে নিতে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ করে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণ সমাবেশ আছে,

কোন অভাব নাই। আর অভাব বলে যা আছে, তাতে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাবেও পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে। ওখানকার বাস্তব-বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাকলেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবরতা-ধর্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সে-দেশে নিয়ে যেতে হবে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্যে, অলঙ্কার শাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌণরস এখানে যেমন বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেখানে তা নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ করতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু করতে হয় না। ইতরব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রার্থিব (দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমচমৎকারিতা আছে; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না— যেমন মেঘে আবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আবরণকারী আবৃত বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখতে পাই না।

সেবা-চেষ্টার ব্যাঘাত হলে, অহঙ্কার বিমূঢ়তাবশে প্রভু হবার যত্ন হলে গুণজাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্বাদিগুণদ্বারা আচ্ছন্ন হলে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণন করতে গিয়ে মিশ্র গুণবিচারে বিচিত্রতা-কারিণী শক্তিকে এরই পর্যায়ভুক্ত করি। কিন্তু নির্মৎসর ও সাধুগণ এসকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁরা পরমধর্মে অবস্থিত, পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎপরায়ণ। ভগবৎস্মৃতিরহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রী কাতরতা-ধর্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্মে নিযুক্ত হলেই পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হবে, আমিই সুখকে একচেটে করে নেব, এজন্য 'আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' ন্যায় অবলম্বন করি! পরমধর্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য। আমি কামী হব, ক্রোধী হব, লোভী হব, প্রমত্ত হব প্রভৃতি বিচারপ্রণালী হতে অবসর গ্রহণ করা কর্তব্য। কামুক, ক্রোধী, লোভী, মূঢ় বা প্রমত্ত হবার যোগ্যতা এখানে আছে; ঐগুলোর সমষ্টি একীভূত হলে মৎসরতা আসে। যদি এগুলোর সেবা না করি, তাহলে মৎসরতা থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে বড়ই প্রয়োজন হয়েছে, কামাদি রিপুকে প্রভু সাজিয়ে তাদের

চাকরী করা; ভগবানের সেবা করব না। তাঁর সেবা করলে এদের সেবা করা হয় না। যাঁরা ভগবানের সেবা না করেন, তাঁরা রিপুষট্‌কের দাস। মৎসরদের ইতরধর্ম যেসকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তাতে বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বস্তু প্রতিম 'পদার্থ' আমাকে ভোগা দেয়, বিপথগামী করে। নির্মৎসর ও সাধুদের পরমধর্ম নিত্য বর্তমান, চেতনধর্মযুক্ত তাঁরা নিত্যের প্রতি সেবাচেষ্টাবিশিষ্ট, অনিত্যের জন্য চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্মের ফলসকল অনিত্য, যেমন—কর্পূর বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব্য মুখখোলা থাকলে উপে যায়, তদ্রূপ কর্মাজিত দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ধ্বংস হয়। এদেশের স্বভাবই এই। অনিত্য, যা নিত্য স্থিতিবান নয়, তাতেই আমাদের আগ্রহ। আমরা ভবিষ্যৎ দেখি না। ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে দ্রব্য রাখলে যেমন সব গলে পড়ে যায় বা বানর যেমন ধান সংগ্রহ করে বগলে রাখে, আবার সংগ্রহ করতে গেলে সেটা পড়ে যায়, সেই রকম ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ- চেষ্টা, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, সংগ্রহকার্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাঁরা নিত্যত্বের আলোচনা করেন, তাঁদের রিপু ষট্‌কের ভৃত্যত্ব করা কর্তব্য নয়। আমাদের বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তন করে অন্য অবস্থায় নীত হব এটাও চাঞ্চল্য মাত্র। পরিবর্তনশীল বস্তুর সংগ্রহের জন্য যাদের উৎকট পিপাসা— নিত্যানিত্যবিবেক যাদের হয় নি, তারা কর্মরাজ্যে নিজেন্দ্রিয় প্রীতিজন্য মৎসরতা-ধর্মে অবস্থিত হয়ে অন্যের ক্ষতি করতে ব্যস্ত। নির্মৎসর না হলে পরমধর্মের কথা কাণে আসে না। যেটা নৈষ্ফল্য উৎপাদন করবে, মৃত্যুই যার শেষ বরণীয়, তাতে ব্যস্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য নয়, আপাতসুখ বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদদর্শীর চেষ্টা নাই। যে জিনিষের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারবো না, নিজের বা নিজদলের ক'-একটা লোকের ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য সেই সকল অনিত্যের সেবা কেন করবো? চিদচিৎ বিবেক বলে একটা ব্যাপার আছে, বুদ্ধিমান লোক মাত্রেরই সেটা চিন্তনীয় হওয়া দরকার। ৩০ বৎসরে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, ৫০ বৎসরে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান লাভ হয়, আবার তদপেক্ষা ৬০ বৎসরের জ্ঞান আরও বেশী। এইরূপে জগতে যে যতদিন বেশী বাঁচবে, জ্ঞানের অভিজ্ঞতা তার তত বেশী বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু তাও অসম্পূর্ণ। পূর্ণচেতনের যে জ্ঞান, সেটা সেই দেশ

থেকে আসে; এদেশে তা' দুষ্প্রাপ্য। ২০০/৫০০ বছরের চেষ্টা-দ্বারাও এদেশে নিত্যকালের জ্ঞান লভ্য হয় না। (Epistemological discre-pancy) জ্ঞান স্বভাব নির্ণয়ে বিপ্লব আনয়ন করে। সাধারণ ধার্মিক সম্প্রদায়ের বিচার সুষ্ঠু নয়। এজগতের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সাফল্যমণ্ডিত হয় না; কিন্তু নির্মৎসর সাধুদের জ্ঞান এরকম জিনিষ নয়। সসীমধর্মের জ্ঞান সংগ্রহ- চেষ্টা নৈষ্ফল্য আনে। বিবেক হলে সন্ধিনী-সম্বিদ-হ্লাদিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান লাভ হয়। সুখৈষণায় ব্যস্ত থাকলে ত্রিতাপ উন্মুলিত হয় না, তাতে সন্ধিনী বিপর্যস্ত হয়। জড়ানন্দে মত্ত হলে হ্লাদিনী নানাপ্রকারে বাধা-প্রাপ্ত হয়। দুঃখই এদেশের normal condition। এখানে দুঃখকে কম করা বা অভাব পূরণের চেষ্টাকেই আমরা সুখ বলি। সভ্যতাচালিত বুদ্ধিতে নিজের সুখচেষ্টা বা স্বার্থপরতা বর্তমান। বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে যে বিচার, তাতে বুঝতে পারা যায় যে, বর্বর জাতি নিষ্ঠুর, সভ্যগণ অনিষ্ঠুর; মানবের সৌখ্যসম্পাদনই এই সভ্যতার উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু সভ্যতার নামে যে বর্বরতা, সেটি পরশ্রীকাতরতায় লক্ষ্য করি। আমার doxy-টা orthodoxy, অন্যের hetero-doxy; তাতে শক্তিত্রয়ের ধারণার অভাব-হেতু অসুবিধা আছে। ওটা থেকে ছুটী পাওয়া দরকার।

পরমেশ্বর বাস্তববস্তু, তিনি বিশ্বের পদার্থ নন। যেমন আকাশ, এর specific designation—ধারণাযোগ্য ব্যাপার নাই। এইটুকুমাত্র ধারণ হতে পারে যে, এটা অন্য জিনিষকে ধারণ করতে পারে। কিন্তু এটা ন্যূনাধিক খণ্ডিত ঘটাকাশের ধারণা; সম্পূর্ণ ভূতাকাশের ধারণা করা যায় না। তিন এর আয়তনের ধারণা হয়ে থাকে, চার এর আয়তনকে infinity or impersonal phase বলে ছেড়ে দিই। মূলবস্তু পরমেশ্বরই বাস্তববেদ্য। মৎসর হলে special scholastic training হতে থাকে—রুচির অনুকূলে কামক্রোধের দাস্যই হয়ে যায়।

বেদ্য—যাঁকে জানা উচিত, সেটি বাস্তববস্তু হওয়া চাই—যাঁকে জানা হবে, তাঁর প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা চাই এবং তা জড়ের স্থূল সমাহৃত সূক্ষ্ম পদার্থ মাত্র নয়। Absolute বললে যাঁকে বুঝায়, সেই বস্তু। সীমাবিশিষ্ট হলে—বহির্জগতে

relativity নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান দিয়ে সংগ্রহ করা জিনিষকে ঈশ্বর সাজান হয়। এটা বিরুদ্ধ জিনিষ। মঙ্গলপ্রদ বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানে হেয়তা নাই। এজন্য 'শিবদ' বলেছেন, যাঁতে কামক্রোধাদির কোন হেয়ত্ব নাই অথচ ঐসকল বস্তু তাতে পূর্ণরূপে বর্তমান। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভূজো যথা'। সেটাকে অপস্বার্থ-বিজৃম্ভিত স্থানীয় দোষদুষ্ট ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। ঘৃণ্য জুগুপ্সা-রতির বিষয় তাঁতে নাই বললে অপূর্ণকে ঈশ্বর বলে খাড়া করা হয়। তাঁকে restricted করা—তাঁর হাত পা বেঁধে ফেলা, চোখ গালা, নাক কাটা, কান বধির করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ণবস্তুর প্রতি আক্রমণ বা বিদ্বেষ। ঈশ্বরকে চিরবিদায় দিয়ে অন্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি যতকাল বর্তমান থাকে, ততদিন ঈশ্বর কি বস্তু জানা যায় না। তিনি আমাদের খানাবাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী, চাকর, খাজাঞ্চী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখবিধানকারী নন। পরছিদ্রানুসন্ধানকারী বা পরপ্রশংসার কার্যে ব্যস্ত ব্যক্তির বিচার হতে উত্তীর্ণ হতে হবে—মানব বিচারকে প্রসারিত করতে হবে। আংশিক non-absolute এর বিচার থেকে ত্রাণ পেতে হবে।

সাধু ও নির্মৎসরগণের পরমধর্ম ভাগবতে বেদ্য। তাঁরা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র নিয়ে ব্যস্ত নন। মানবহিতার্থি- শ্রেণী মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার নিয়ে আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বহিতরত হওয়া দরকার। যেমন শ্বেতাম্বর দিগম্বরের বিচারে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাণিমাত্রেরই উপকার করা দরকার; কিন্তু দেহ-মনের উপকার নয়। সকলের সুখোৎপাদন করলে ভগবান্ নারাজ হবেন না। তবে 'গরু মেরে জুতো দান' এর নামে যে পরোপকার, সেটার মধ্যে মৎসরতাই বর্তমান। উহা গোবধ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজনের উপকার করতে গেলে আর একজনের হিংসা হয়। কারা উপকার করতে পারে? যারা অপকার করবে না, সেই নির্মৎসরগণ। কিন্তু আজকালের লোকের উপকার করলে তার প্রতিদানে অপকার করাই তাদের স্বভাব। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতেন, "আমি ত তোমার কোন উপকার করি নাই, তবে তুমি কেন আমার অপকার করলে?" বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যে চিন্তাস্রোত—পরের উপকার করা, সেটা দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা। ঈশসেবাবর্জিত প্রাণিমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।

বাস্তব সত্যের সেবানুসন্ধান পরিত্যাগ করে বাজে কাজে দিন কাটান বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অস্থায়ী বা অসতে ত positive injury আছেই, কিন্তু সৎকর্মের নামে যে পাপকার্য, তাতে কতকগুলি লোকের relief হলেও পাপ কতটা হল, সেটার বিচার হলে দেখা যাবে, পাপের দিকটাই তৌলদণ্ডে বেশী ওঠে। সংকীর্ণ ধারণায় চালিত হয়ে শ্রেণীবিশেষের উপকার করতে গেলে কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস—এটাকে (faulty altruism) দোষযুক্ত পরার্থিতা বলে। এর অসম্পূর্ণতা অনেক সময় ধরা যায় না, কিন্তু ভাগবতের পরমসত্য কথা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এর defect ধরিয়ে দিতে পারেন।

পরমেশ্বরের সেবা যাঁরা করেন, তাঁদের সেবা করতে হবে—তাঁদের সংস্রবেই থাকতে হবে। একতাৎপর্যপর হয়ে এই সর্বজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। —যাঁ হতে শুধু এই ইন্দ্রিয়জজ্ঞানগম্য জগৎ নয়, অনন্তকোটী জগৎ উদ্ভূত হয়েছে, তাঁর কথা আলোচনা করা দরকার। ঈশ্বরবিমুখ লোকের মধ্যে কামের অতৃপ্তিতে ক্রোধ, ক্রোধের উদয়ে লোভমোহাদি অশান্তিপ্রদ অবস্থার উদয় হয়। কিন্তু Harmony—প্রেম তা হতে স্বতন্ত্র জিনিষ। ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত না হলে অপরের বিদ্বেষকে প্রেমা বিচার করা হয়।

'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' এটা গল্পের কথা নয়। মনগড়া ঈশ্বর তৈরী করলাম বা (স্থূল) মতবাদ সৃষ্টি করে কতকগুলো লোকের সময় নষ্ট করলাম, তা নয়। তাঁকে সত্য সত্য পাওয়া চাই। তিনি সেব্য, আর আমরা বশ্য। বশ্য যাঁর সেবা করে, তিনি ঈশ্বর। জড়জগতের বস্তুর বাধ্যতা স্বীকার করলে সেই জিনিষের সেবায়ই—Particular engagement এ দিন কাটে, বাকী সব বাদ পড়ে যায়। এই সীমার মধ্যে থেকে কি লাভ? ক একদিন পরেই মরতে হবে। পূর্ণের সেবায় সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা দরকার। পূর্ণ কি বস্তু, তাঁর জ্ঞান হওয়া দরকার। হ্লাদিনী-সন্ধিনী সংবিৎ-সংযুক্ত পূর্ণবস্তুর নিকট কি করে পৌঁছুতে পারি, ২৪ ঘন্টা কি করে তাঁর সেবা করতে পারি, এজন্য চিন্তা করা দরকার। যেকাল পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, পরদ্রোহ আমাদের আক্রমণ করে রাখে। যতদিন না অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আস্বাদক-

আস্বাদ্যভাববিশিষ্ট না হতে পারি, ততদিন অন্যত্র চালিত হয়ে অসুবিধা ভোগ করব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশবৈমুখ্য লাভ করে কেবল অন্ধকারে হাতড়ান কথায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু ভাগবত শ্রবণ করলে ঈশ্বর সদ্যঃ সদ্যঃ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হবেন।

এই ভাগবতকথা মহামুনি নারায়ণ নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে বলেছিলেন। তিনিই আচার্য। পূর্বজন্মে অপান্তরতমা নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনিই বেদবিভাগ করেছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক বিচার ইনি নারদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। এ সকল কথা জগতে প্রচার হওয়া কর্তব্য। আমরা মনুষ্যের কল্পনারাজ্যের ঈশ্বরের কথা বলছি না। তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ রাখলে ছোট করা হয়। কিম্বা দয়ার মূর্ত্তি, দয়াময় প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ করলে সঙ্কীর্ণতা থাকবে, পূর্ণবস্তুর আলোচনা হবে না। অনর্থমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জিনিষের উপলব্ধি হয় না। অনর্থে থাকলে প্রয়োজন বুঝতে না পেরে অসত্যকে সত্য বলে বিচার হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অনর্থ নিবৃত্ত হলেই ভগবদনুশীলন আরম্ভ হয়। যেমন জোলাপ নেবার পর ঔষধ খেলে ক্রিয়াবিশিষ্ট হয়, তা না হলে সেটা অম্লা-দিতে পরিণত হয়ে যায়। নির্মিত সৌধ থাকলে তার পরিবর্তন বা নূতন করে গঠনাদি করতে হবে। অনর্থযুক্তা-বস্থায় এটি হজম হবে না। জনমত-সংগ্রহে বিবদমান ব্যাপারে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার মত হয়। তবে বহু সমব্যক্তির মধ্যে autocracy দোষাবহ। বহুজনমত-সংগ্রহ প্রয়োজন মনে করলে একের প্রস্তাব অন্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। চেতনরাজ্যে Autocrat Despot একমাত্র তিনি (পরমেশ্বর)। ঐগুলি এখানে অনুপাদেয়। ১৮০ ডিগ্রীকে angle না বলে ঋজুরেখা বলা হয়। ভগবদ্ বস্তুতে কোণজভাব আছে, কিন্তু কোণসমূহ ঋজুত্ব লাভ করলে কোণজ ভাবের দোষ স্পর্শ করে না।

বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্তব্য, তা হলে বাস্তবিক মঙ্গল হবে; man of action—কর্মবীর হলে অপর প্রবল কর্মবীর-দ্বারা আক্রান্ত হতে হবে। জ্ঞানপথের (Gnosticism) সাহায্যে নিজেকে খুব যুক্তিযুক্ত (rational) মনে করা বা ব্রহ্মে বিলীন করা ইত্যাদিতেও সুবিধা নাই। যাঁর জগত, তাঁর

আনুগত্য বিচারেই বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য বা সাম্যের অভাব ততদিন থাকে, যতদিন না আমরা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্খতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"।।—এই শ্লোকের বিচার বুঝতে পারি। আমাদের পরা ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত---অক্লান্ত সেবা-কার্যের বিচার না এলে, পুরুষোত্তম, উরুক্রম, ত্রিবিক্রমের সেবা না করলে অভক্তির পথে থাকতে হবে; কর্মের আরাধ্য ফলাকাঙ্ক্ষা বা জ্ঞানমার্গে নিজের নিজত্ব-বিনাশ—বিচার আসবে। জ্ঞানীর বিচার খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যার ন্যায়। এ অমঙ্গলের রাস্তা থেকে মনুষ্য-মাত্রকেই সাবধান করে দিতে হবে। এই রকম অদূরদর্শিতা থাকার মূল্য অন্ধকপর্দক। এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাস্তববস্তুর অনুশীলন করাই আবশ্যক।

আত্মার ধর্ম ভক্তি। অনাত্মধর্ম---Self contradiction বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যেটাকে এখন ভাল বলে, পরে সেটা নষ্ট করে ফেলে, স্থাপিত বস্তুকে সংহার করে; কিন্তু Chemical Laboratory-তে analyse করে দেখলে মনে বাস্তববস্তুর নিত্যসেবা করাই আত্মধর্মীর বিচার। তাঁরা প্রভু, ভোগী বা ত্যাগী হবার চেষ্টা করেন না। তাঁদের সেব্যবস্তুর নির্ণয়ে অবিবেচনা হয় না। পরমেশ্বরই সেব্য হউন। তদধীন বিশ্বের পদার্থগুলিকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে অধঃপতন হয়। বিশ্বপতির সঙ্গে ভৃত্যশ্রেণীর সমত্ববিচার অমঙ্গল আনে।

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ
সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।"

যদি পূজ্যবস্তুর সেবা গ্রহণ করি, তা' হলে নরকে যেতে হবে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে পারি; কিন্তু অর্চ্য বিষ্ণু শালগ্রামকে গণ্ডকীশিলা মাত্র বুদ্ধি করলে ভুল হয়। গুরুকে লঘুজ্ঞান করলে নরকে গমন করতে হবে। অবস্তুর সঙ্গে বাস্তব বস্তুর সমত্ববিচার ঠিক নয়। জাগতিক পদার্থের সঙ্গে তজ্জাতীয়ের সমতা হোক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান করার চেষ্টা মূর্খতা

মাত্র। বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁরা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হবার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁদের অন্যলোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুপদধৌত গঙ্গাজল, বৈষ্ণবের পাদোদক প্রভৃতিকে অন্য জলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয়। হবে দুটোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। একটির স্বভাব এমন যে, জড়জগৎ ধ্বংস করে কেবল চেতনধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আর একটি ঠিক তার বিপরীত। seeming feature এ ঠিক আছে; কিন্তু সেটা ভিতরে নাই। গুড়ের নাগরীর উপরে খানিক গুড় দিয়ে ভিতরে শেয়ালের হাড় প্রভৃতি যেতে পারে; সন্দেশের সঙ্গে ময়রার নাকের পোঁটা, ঘাম থাকতে পারে; কিন্তু বাস্তবসত্যকে ঐ প্রকার মিশ্রভাবের (adulteration) মধ্যে ফেললে সর্বনাশ। পরমার্থকে ordinary economy-র সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সঙ্গে, শিক্ষিতকে অশিক্ষিতের সঙ্গে, পারমার্থিককে অপারমার্থিকের সঙ্গে সাম্যবিচার পয়সার জোরে করা যেতে পারে; কিন্তু তা হলে 'পদ্মানীতি' হয়ে যায়।

সাধুদিগের---নির্মৎসরদিগের পরমধর্ম আলোচ্য হওয়া উচিত। ধর্মার্থ-কাম-ভোগে বা মোক্ষরূপ ত্যাগের কথায় যাঁরা আবদ্ধ থাকবেন, বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞান-লাভে অমনোযোগী হবেন, তাঁরা ত্রিতাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। যাঁদের চতুর্বর্গাভিলাষ নাই, যাঁরা ভগবৎ- প্রেমার ভিখারী, তাঁদের সঙ্গেই পরম মঙ্গললাভ হয়। অনায়াসলভ্য বস্তুর জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, চতুর্দশভুবনাতীত কালাতীত পরম-বস্তুই প্রয়োজনীয় হউক।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।।

দশম দিবস

(২৯।৮।৩৫, বৃহস্পতিবার)

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।

আমরা পূর্বদিবস আলোচনা করেছি—"ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" শ্লোকের অভিধেয়ত্ব-বিচার। অনেকে মনে করেন যে, "কর্ম ও জ্ঞান যেমন এক একটি পথ, তদ্রূপ ভক্তিও একটি পথ মাত্র; এই অভিধেয়ের যখন প্রকারভেদ আছে, তখন কেবল ভক্তি আশ্রয় করলে অসুবিধা হবে, ভুক্তি বা মুক্তি পাব না, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হতে বঞ্চিত হতে হবে।" কেউ মনে করেন —"ব্রহ্মের সহিত একীভূতত্ব হয়ে যাওয়ার ব্যাঘাত হবে।" কিন্তু এই সকল পূর্বপক্ষের নিরাস করেছেন ঠাকুর বিল্বমঙ্গল উপরিউক্ত শ্লোকের দ্বারা। আপনাদের হয় ত' স্মরণ থাকতে পারে, 'প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছি—ধর্মার্থকামমোক্ষ যাঁদের বাঞ্ছনীয়, তাঁরা নির্মৎসর সাধুদিগের পরমধর্ম বুঝতে পারেন না। "ঐহিক বা আমুষ্মিক ভুক্তি অর্থাৎ ইহ জগতে বা পরজগতে ভোগ অথবা মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হওয়া প্রভৃতি লাভ হবে না, যদি ভক্তি লাভ করা যায়; ভক্তিটা একঘেয়ে কথা, ধর্মার্থকামমোক্ষধিক্কারী ভক্তিপথে ঐসকল কথা বাদ যায়"—এরূপও অনেকের ধারণা। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সাহস দিয়েছেন যে, তোমাদের সেরূপ আশঙ্কা করবার কোন কারণ নাই; যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্‌বস্তু পুরুষোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হবে—অখিলরসামৃতসিন্ধু ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাবে; কেউ বাধা দিতে পারবে না—যদি সেবা প্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফূরত্যদঃ।" তিনি ত' অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্যবিষয় নিশ্চয়ই

হবেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে; তা' হলে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না করে ধরা দেবেন, বললেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি **bonafide servitor**, আমি এসেছি সেবা কর। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নিজ সেবার ইচ্ছা করলে তাঁকে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"ত্রেধা নিদধে পদম্"—তিনি আপনা হতেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা করলে—ব্যবহিত-রহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে সেব্য বসে থাকতে পারেন না, এগিয়ে আসেন। যেমন বেদে লেখা আছে—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।।"

তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ করে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরমরমণীয়—পরমসৌম্যমূর্তি কৃষ্ণ বার্দ্ধক্যজনিত জড়কালক্লিষ্ট শ্লথচর্মবিশিষ্ট নহেন, তিনি নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁর সকল প্রকার সেবা করতে পারি—পত্নীসূত্রে পতিজ্ঞানে, পিতামাতাসূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হয়ে।

তিনি ছাড়া বস্ত্বন্তর নাই। আমাদের নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করলে সেবার নৈরন্তর্য থাকলে, সেবাতে রুচি—আসক্তি হলে ভাবের সমাবেশ সামগ্রী সম্মেলনে স্থায়িভাব রতি সংযোগে রস লাভ হবে। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" রসময় রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হলে—আনন্দময়কে পেলে ক্ষতি হবে না। ধর্মার্থকাম—যার জন্য মানুষ আকাশ-পাতাল আলোড়ন করে একটি, দুইটি বা তিনটিই লাভ করেন, তারা ভৃত্যসূত্রে হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে; যেগুলোর জন্য পরিশ্রম করে জন্মজন্ম পরে

সুফল পায়, তারা কখন আজ্ঞা করবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা করে। আর মুক্তি---সমস্ত বন্ধন হতে মোচনপ্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা, সেটি হাত যোড় করে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম প্রভৃতি অবলম্বন করে---কত তীব্র-তপস্যা করে সমাধি-লাভের জন্য যে চেষ্টা---কৃচ্ছ্রসাধন, তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা' ভগবদ্ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁছান যাবে না, ত' নয়, ওগুলো বা ওদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হয়ে যাবে---

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশদে তদনন্তরম্।।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।

মুক্ত পুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা ---কর্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হলে কর্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হলে রসরাহিত্য---কাব্যসাহিত্য শুকিয়ে গিয়ে রাহিত্য, শুষ্ক দর্শনবাধ---যাতে অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তি-পথে অন্য জিনিষের প্রভু হবার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্মী হওয়া সম্ভবে না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হতে পারেন না। তাঁকে চাকর করবার প্রয়াস করলে বেশী অসুবিধায় পড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্তৃত্বাভিমান, তা' ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী---ধ্বংসশীল; আর কর্মের দ্বারা প্রাপ্য—জড়রসভোগ। ভক্তিরস নিত্য—পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। অভক্তিতে কর্মগ্রহিতা, সেটা আপাত আলেয়ার পেছনে দৌড়ান, পরে নৈষ্ফল্য; উহাতে বৈমল্য নাই, উহা নির্মল নয়---মলিনতাযুক্ত।

রস দুইপ্রকার---একটি জড়রস---আমরা বদ্ধবিচারে যার ভোক্তা; অপরটি ভক্তিরস---যদ্দ্বারা রসময় রসিকশেখরের সেবা হয়; এইটিই প্রয়োজনতত্ত্ব। রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয়।

আমরা 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংক্ষেপে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ও 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ' শ্লোকে অভিধেয়ের কথা আলোচনা করেছি। এক্ষণে প্রয়োজন---প্রাপ্য পদার্থের বিচার করা হবে। সম্বন্ধের পরবর্তী-সময়ে প্রাপ্যবিচারের কর্মে নিযুক্ত থেকে পাব কি? তদুত্তরে বলা হয়েছে---

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।"

প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভাগবত-শ্রবণ সকল লোকের ভাগ্যে হয় না। যাঁরা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাদেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধি লাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে-তাকে দেওয়া হয় না, অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা স্নিগ্ধ, তাদের বিচার---"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসবসেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব করতে আনন্দ পাই---অন্যের চাকরী করতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হলে যেমন পাঠে সুবিধা করতে পারে না, সেই রকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজন-জ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তা'দিগকে ভাবুক বলা যায় না; তাদের রসপ্রার্থনা নাই, রসরাহিত্য---যেমন চচ্চড়ী, উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুকনো ব্যাখ্যা। আর না হয় পান্তা---রসাল হলেও জড়রস। জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তারা বলে, আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তারা ভগবদ্ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না, তাদের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবত-রচয়িতা বলেছেন---"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আম, লিচু, কাঁঠাল যে-রকম গাছের, সে রকম গাছের ফল নয়; কিন্তু কল্পতরু---যে যা' চায়, তাকে তাই দেয়---সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ---কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠুজ্ঞানময়---চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্মই চেতনের ধর্ম,

বহির্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তাতে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম-জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত কিরূপ ফল? কাঁচা, কষা বা ডাঁসা নয়; তা' পাকা, আবার পাকার পরেও গলিত—রসপরিপূর্ণ, তাকে চিবুতে হয় না; যার দাঁত নাই সেও গিলে খেতে পারে, এমন তরল গলিত ফল। ভাগবতবিরোধি-বিচারে যে রস, সেটা কষায়। ভাগবত শুকমুখ থেকে গলিত, যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, তিনিই আস্বাদন করেছেন। ভোগে প্রমত্ত হলে বিপথগামী হতে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার- ভোগ করে ছেড়ে দেয়; আর অভুক্ত—যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আকৃষ্ট না হয়েছে। উভয়েই বিরাগধর্মে অবস্থিত হলেও জড়বিচারে ভুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জানার পরে আকর্ষণের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে, বিপদে একবার পড়েছে।

শুকের মুখের পাকা ফলটি—শুকপাখী খেয়েছেন, তাঁর মুখ হতে অন্যে আস্বাদন করবে বলে উচ্ছিষ্ট রেখেছেন, শুক নিজে খেয়ে অনুগত ব্যক্তিদের তা খাওয়াচ্ছেন, বলছেন—বড় ভাল, তোমরা সকলে আস্বাদন কর। শুকের পঠনকার্য বাবার কাছে যা' পড়েছেন, সেইটি আউড়ে দিচ্ছেন। যেমন শুকপাখীকে পড়ায় —"পড় পাখী আত্মারাম। হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।" যা' পড়েছেন হুবহু বলে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও করেছেন। আস্বাদনে ভাল লাগার দরুণ জিনিষটাকে বিমর্দিত—বিপর্য্যস্ত না করে ঠিক ঠাক বলেছেন। মজঃফরনগর জেলায় শুকরতলে দ্বিতীয় বৈঠকে বহু ঋষি, সূত ও পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন—যাঁরা আস্বাদনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাঁদিগকে ভাগবতফল—কৃষ্ণলীলা-ফল আস্বাদন করিয়েছেন। সূত সেইটি শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে বলেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ; শুক তার গলিত অর্থাৎ পরম প্রপক্ক ফলের সুস্বাদ পাওয়ার দরুণ অন্যলোককে তাঁর অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।" যেমন কবিরাজ গোস্বামী প্রভু দৈন্যভরে তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে বলেছেন—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে আমার জন্য যে অবশিষ্ট রেখেছেন; আমি তাই

আস্বাদনের প্রয়াস করছি। শ্রীচৈতন্যলীলার পূর্বার্ধ—চৈতন্যভাগবত, পরার্ধ—চৈতন্যচরিতামৃত।

'অমৃত' অর্থে যা' মরে না, নষ্ট হয় না, যা' খেলে মানুষ মরে না,—সুধা। যে বস্তুটি দ্রব—অতি মসৃণ, একটুও কঠিন (Stiff) বা খস্‌খসে নয়, সহজে গ্রহণীয় যাহা—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপ যার বিচারে লিখেছেন—

সম্যঙ্ মসৃণিতঃ স্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।

ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।।

সেই বস্তুটি প্রেমা। অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁর প্রবন্ধ পান করে আস্বাদন কর—অলোচনা কর। সেটি কি রস? তাতে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই বলা হয়েছে। জীবের ভোগে নানা বাধা; ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে আর একজন সুখী হতে পারছেন না। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হলে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।" "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

"এক হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ।"

—প্রভৃতি বিচার হলে কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দী অসমোর্ধ বিষয়-জ্ঞানের ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আসবে।

'আলয়' অর্থে বাড়ী। রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হয়ে গেলেও যার বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হোক—যেকাল পর্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। জড়রসশাস্ত্রে পণ্ডিত হলে বিদ্যাসুন্দর, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির আলোচনা হয়ে যাবে। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা করেছেন, জড়রসের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকলেও সমান নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান করলে মূঢ়তার পরিচয়ই দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হতে হলে ভাগবতরস পান কর।

ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্‌ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

অন্যান্য পুঁথিতে অনেক কথা বর্ণিত আছে। মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা সুষ্ঠুভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁরা থাকতে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁরা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁদের আলোচনার বিষয় হবে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হলে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁদের বিচার, তাঁরা ভাগবত আস্বাদন করুন। তা'হলে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্যন্ত ভাগবত পড়তে হবে।

এই গ্রন্থটি বেরসিকের হাতে দিতে নিষেধ। অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে আবদ্ধ যারা, ভোগাকাঙ্ক্ষা বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষা যাদের আছে, তাদের জন্য ভাগবত নয়। অনর্থ নিবৃত্ত না হলে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হতে পারে না। শ্রবণ অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হলে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যাদের মনোযোগ নাই, যারা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি করে হবে তাতেই মনোযোগী, তাদের নিজ মঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ' আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহুরী না হলে মূল্যবান্ বস্তু কিনতে গিয়ে ঠক্‌তে হয়। রস কি প্রকারে তৈরী হয়, আলোচনা না করলে ঠকে যাব। অভিধেয়-শ্লোকে যা' বর্ণন করেছেন—যেটি কেবল ভক্তিরস, তার সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা, আবার সন্ধান পেয়েও প্রয়োজনবোধ না হলে তাতে অযত্ন হবে। "আমার সুবিধা হচ্ছে না যাতে, যাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, সেটি চাই না"—ঈদৃশী চিত্তবৃত্তি যাদের, তাদেরও জানাবার জন্য ভক্তগণ সর্বদা উদ্‌গ্রীব। আর যারা জেনে বাদ দেয়, তাদের সঙ্গ বহু দূর হতে ত্যাগ করে 'দূরত দণ্ডবত' বিচার করেন।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।"

অনর্থ থাকলে কেবল ভোগের কথা ভাল লাগে, প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রয়োজনতত্ত্ব ভাল লাগে না; অসৎসঙ্গপ্রভাবে এই দুর্বুদ্ধি হয়। আর সৎসঙ্গে কৃষ্ণ ভোক্তা—এই জ্ঞান হয়। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণে 'কর্মকাণ্ড', আর হৃষীকেশের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিচারে 'ভক্তি'। দুঃসঙ্গ-প্রভাবে অনর্থযুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। অনর্থ-মুক্ত হলে প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে রসাপ্তি, আস্বাদক কৃষ্ণের আস্বাদ্য রসের স্বরূপানুভূতি ও

কৃষ্ণকে আস্বাদন করান কার্য হয়। 'কৃষ্ণভোগী' 'গৌরভোগী' 'পুত্তলভোগী' প্রভৃতি অভক্তের কথা। তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। তা' হলেই ভাগবত শুনতে পারা যাবে।

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষুদ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।"

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর করে প্রসাদ খাওয়াতে হবে, যার আদৌ ইচ্ছা নাই, তাকে প্রসাদ দিতে হবে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থাকলে অপরে মন্ত্র পড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবক-সম্প্রদায় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেন। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হলে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হলে দীক্ষিত হয়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয় আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এঁদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুনবে না, সব জেনে নিয়েছি বলে শয়তানী করবে, তাকে 'দণ্ডবত দূরত'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার—যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণ যা দেবেন, সেইটুকুই তাঁরা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা মহা-ভাগবতের বিচার। যদি স্মার্তবুদ্ধিতে "চুল পড়েছে, কুকুরে ছুঁয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তা'হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—

"নান্নদোষেণ মস্করী"

ত্রিদণ্ডিগণ রসুই করেন না, অন্যের রসুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁদের "কাঁচী বা পাকী নিমন্ত্রণ" বিচার নাই। "যেখানে পাকী নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচীতে যাব না"—এটা জিহ্বা-বেগ।

জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি ধায়।

শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।।

আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়েছেন,---ধনী লোকের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করবে না, তাতে জিহ্বাবেগ আসবে---'ভাল খাব' বিচার হবে। ভক্তি কিছুমাত্র থাকলে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত করে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হতে আসে, ভগবান্ ভাল-মন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্তব্য ভগবন্মহিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অন্যলোককে জানান। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব বলে দৌড়ুলে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা---কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হতে স্বতন্ত্রা। সকল লোক সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক। রসাপ্তিকাল পর্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপদর্শন, কর্ণে শব্দ শ্রবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সনকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুণ-শ্রবণে যে সৌগন্ধ, তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন---

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গত স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।।

(ভাঃ ৩।১৫।৪৩)

[সনকাদি মুনিগণ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করলে পর ভগবানের শ্রীচরণকমলের কেশরের সহিত সংলগ্ন তুলসীপত্রের গন্ধযুক্ত বায়ু মুনিগণের নাসারন্ধ্রযোগে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন সেই মুনিবৃন্দেরও চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং গাত্রে পুলক উৎপন্ন করল।]

ভগবান্ গুণহীন,---ইহা শুষ্ক-জ্ঞানীদের বিচার; তাঁরা অখিল চিদ্‌গুণসমষ্টির আলোচনা না করে জড়গুণের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হলে তাঁতে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণগুণাখ্যানে বহু মুখ হয়ে যায়---বক্রেশ্বর পণ্ডিতের

মত। ''আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে''। কৃষ্ণানুশীলন না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হয়ে লোকে বাস্তবসত্য গ্রহণ করতে পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হবার দুর্বাসনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধনভক্তিতে ভাব, তৎপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটি বিচার আছে---সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি ও প্রেম ভক্তি।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

এই শ্লোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' এইটি অভিধেয় এবং ''ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ''---এইটি ফল। তখন রসরাহিত্য কেটে যাবে। 'সৎসঙ্গ' পঞ্চপ্রকার ভক্তির একটি অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন, তাঁর সঙ্গ করতে হবে। যে উদর-ভরণে ব্যস্ত, তার সঙ্গ করতে হবে না। যদি মিউনিসিপ্যালিটি হতে নোটিশ দেয় যে, স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীটানাতে বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তবে সে আর ভাগবত-পাঠ করবে না। ইঞ্জিনীয়ার হলে যদি বেশী পয়সা পাওয়া যায়, তা'হলে ভাগবত-পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন ভাগবতপাঠী তার অনুগ্রহের পাত্র হবে। তা' হলে ভাগবত শুনতে পারলো না। আত্মনিবেদন না হলে ভাগবত শোনা যায় না।

ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জন প্রয়োজন হলে দুই একটা গল্প পাঠ করবে। অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ করবে---না হয় আর কিছু।

ভাগবত পড়লে ''রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপম্'' বিচার বুঝতে পারবে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রস। সেই লীলাময়ের কথাগুলির তারতম্য বিচার করলে দ্বাদশ রসে রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হবে। তাঁর সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণজ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁর সৌখ্যবিধান করলে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ে হয় না।

তা' হলে এটি আলোচনা হলো যে, সম্বন্ধজ্ঞান প্রথম শ্লোকে, অভিধেয় দ্বিতীয় শ্লোকে এবং প্রয়োজন তৃতীয় শ্লোকে।

কাকে ভাগবত দেওয়া হচ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ করলে কি পাবে?

পূর্ণপুরুষের আনন্দ হবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখবার থলি (Cavity) কতটুকু? ভগবানের অসীম উদর। বাহান্ন, চুয়ান্ন বার খান, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি। খানিকটা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ করবো, এই চিন্তাস্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁর প্রসাদবুদ্ধিতে তদ্দত্ত অবশেষই গ্রহণ কর্তব্য।

ভাগবতে, কৃষ্ণভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তা' লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণ-কর্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—

আদদানস্তৃণং-দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।।

আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হয়ে থাকতে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

তা' হলে মোটামুটি আলোচনা হলো—

"বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।"

বেদের প্রপক্ক ফল যে ভাগবত, তাঁর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কথা সুষ্ঠুভাবে আস্বাদন-যোগ্য করে তিনটি শ্লোক পড়লেই হয়, তা' হলে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকে সংশ্লিষ্ট 'যাবানহং যথাভাবঃ', 'অহমেবাসমেবাগ্রে', 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত', 'যথা মহান্তি ভূতানি', 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং' প্রভৃতি শ্লোকগুলিতে সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার। অভিধেয় বিচারে 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মঃ', 'ভক্তিযোগেন মনসি' এবং প্রয়োজন-বিচারে 'আসামহো চরণরেণুজুষাং', 'তাং কিং নিশাঃ স্মরতি' প্রভৃতি শ্লোক প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হবে। তখন আমাদের বিপ্রলম্ভ-বিচার প্রবল হয়ে উঠবে—রসশাস্ত্রবিচারের পূর্ণতম প্রাকট্য হবে। তখন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নাচে গায় পরম আনন্দ।।"

—ভক্তিরস বুঝতে পারব—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি আলোচনা করবার বিচার প্রবল হবে।

একাদশ দিবস

(৩০।৮।৩৫)

নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্বীতলং
গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ।।

যাঁর পুলকাঞ্চিত গাত্র প্রস্ফুটিত কদম্বপ্রকাশকে নিন্দা করে, যিনি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে মুহুর্মুহুঃ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন করেন, নৃত্যকালে যাঁর অনর্গল অশ্রুধারা ভূমিতল সিক্ত করে এবং যিনি নিজ গীতকারী পার্ষদগণ-পরিবৃত, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি স্তব করি।

যে মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দের নাম কীর্তনকালে সকল-ভাব-সমন্বিত হয়ে জগতের নিকট নিজের কথা জানিয়েছিলেন, যিনি বার্ষভাবনীর রসের সহিত রসময়ের ভজনের কথা জগতে সাত্ত্বিকভাবভরে জানিয়েছিলেন, সেই সপার্ষদ-গায়কবেষ্টিত গৌরসুন্দরকে নমস্কার করি।

আমরা গতকল্য প্রয়োজনতত্ত্বের বিশেষ কথা—ভাব ও প্রেমভক্তিতে যে রসের বিচার, সেই কথা—যা ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সেটি আলোচনা করেছি। রস অর্থাৎ যেটি আস্বাদন করা যায়। সেই রস আস্বাদন যিনি করেন, তিনি বাস্তবিক রসিক, তাঁকে যাঁরা আস্বাদন করেন, তাঁরাও সেই রসের প্রার্থী। ইহজগতে আমরা সকলেই জড়রসের কথা জানি। বর্তমানে আমরা যে জগতের অধিবাসী, সেই অচিদ্‌রাজ্যে আমাদের আনন্দবর্ধন হয়—আস্বাদন-সৌখ্য হয় জড়রসে; কিন্তু ভাগবত যে ভক্তিরসের কথা বলেন, তার কথা অনেকে জানি না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় ভজনীয় বস্তুর আস্বাদন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ যে রস আস্বাদন করেন, সেই রসের সাদৃশ্য আমাদের রসে থাকলেও আস্বাদকসূত্রে ক্ষুদ্রতা ও নানা বাধা লাভ করার যোগ্যতা থাকায়

রসিকগণাগ্রগণ্য ভগবানের সঙ্গে তুলনা হয় না। তিনি রসের পূর্ণ অধিকারী। তাঁর কাছ থেকে যদি সেই রস প্রার্থনা করি, তা' হলে ভক্তিদ্বারা তাঁর সেবায় সংশ্লিষ্ট হয়ে সেব্য বস্তু কি প্রকার রস আস্বাদন করেন, তা' জেনে রসময়ী লীলার সেবার যোগ্যতা লাভ হয়। কিন্তু বর্তমানে মন ও দেহ আত্মজগতের ক্রীড়ার কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনার বিরুদ্ধে বাধা প্রদর্শন করছে। ক্ষুদ্রতা, পরিচ্ছিন্ন অবস্থা সর্বজ্ঞ ও সর্বরসের আশ্রয় হতে পারে না বলে ভগবানের রসের বিস্তারযোগ্যতা হচ্ছে না। অনর্থনিবৃত্ত হলে সেই রসে অধিকার লাভের যোগ্যতা হয়। অনর্থনিবৃত্ত হবার পর অগ্রসর হতে হতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব সম্বর্দ্ধিত হলে স্থায়িভাব রতিতে প্রতিষ্ঠিত হব। তাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, অভ্যাগত প্রভৃতি সামগ্রীর সম্মেলনে যে রসের উৎপত্তি হয়, তাতে অধিকার পেয়ে ভগবৎপ্রীতি সংগ্রহ করব। ভাগবতে রসময়ের যে লীলা বর্ণন করেছেন, তাতে কিছু অভিজ্ঞান থাকলে অগ্রসর হতে পারবো। ভগবান্ বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন প্রকাশমূর্তি ও লীলা প্রদর্শন করেন। যেমন জয়দেব বলেছেন—

"বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূলোকমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যাং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।"

সেই কৃষ্ণ দশপ্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ করে বিভিন্ন রসের লীলা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেই রসপূর্ণতা আছে। তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। তাঁ' হতে আংশিক ভাবসমূহ বিভিন্ন অবতারের মধ্যে কিছু কিছু আছে। যেমন হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ প্রভৃতি গৌণরসের মধ্যে করুণরসটি বুদ্ধে আছে। অবতারসমূহে সকলরসের পূর্ণতা নাই, কারুণ্য আছে মাত্র। তাঁরা করুণাপরবশ হয়ে কিছু লীলা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আবেশাবতার, স্বাংশ নহেন, জীববিশেষ; তাঁতে ভগবানের করুণাশক্তি নিহিত হয়েছে। বিষ্ণুর আবেশাবতার বুদ্ধদেবে যে করুণা, সেই পূর্ণ করুণা বুদ্ধের অনুগত জনের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁরা কৃষ্ণের কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝতে পারেন নাই, বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করেন নাই। তাঁরা জানেন, বুদ্ধদেব কোন তাপস, সাধন করে সিদ্ধিলাভ

করেছেন, জগতে করুণা-বিতরণের লীলামাত্র প্রদর্শন করেছেন। তাঁর দ্বারা বৈদিক আলম্ভবিধি--যজ্ঞবিধিতে যে পশুবধ, সেইটি নিবৃত্ত হয়েছে। দুর্বল পশুর প্রতি অত্যাচার না করা, বলবানের দুর্বলের প্রতি হিংসা না করা তাঁর দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। তাঁতে তপস্যা প্রভৃতির যে বিচার, তদ্বিষয়ে আমরা জানি---

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।"

এই ভগবদ্বিষয়ে বৌদ্ধগণ আলোচনা করেন না বলে তাঁরা তপস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু নারদ-ঋষি নারায়ণ-ঋষি হতে যে তথ্য পেয়েছিলেন, যাহা ব্যাসের লিখিত গ্রন্থে প্রকাশিত, যে কথার ভাগবত-নামে পরে প্রসিদ্ধি হয়েছে, তাতে ভগবানের ভক্তির কথা—দশাবতারের কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু ব্যাসের পরবর্তী-সময়ে বুদ্ধ আবেশাবতার হলেও তাঁর অনুগত জনগণ তাঁকে বিষ্ণু না জেনে, ইহজগতের লোক---একজন তাপস-মাত্র জানেন। তিনি পরদ্রোহ করতে দেন নাই; পশুজাতিকে, মানবজাতিকে আক্রমণ করতে দেন নাই। পশুদের প্রতি দয়া করেছেন, পশুবধ থেকে অবসর দিয়েছেন। নিম্নসৃষ্টির প্রতি দয়াবিধানের যে ব্যবস্থা, তা' নিম্নশ্রেণীর দয়া। পশুবধ করতে হলে বেদবিধি---যজ্ঞবিধিতে করা কর্তব্য, তার যে অপব্যবহার হচ্ছিল সেটি নিবারণ করেছেন। বেদব্যাসও শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা প্রচুর পরিমাণে লিখেছেন---

"লোকে ব্যবায়ামিষ-মদ্য-সেবা
নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।।"

"যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।"

(ভাঃ ১১।৫।১১, ১৪)

[জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণিমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম বলে স্থিরীকৃত থাকলেও উহা শাস্ত্রবিধানের অনুজ্ঞা নহে, পরন্তু যদি এ সমস্ত কার্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ অসম্ভব হয়, তা' হলে বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞদ্বারা আমিষভক্ষণ এবং সৌত্রামণীনামক যজ্ঞের দ্বারাই মদ্যপানের নিয়ম বিধান করা হয়েছে মাত্র। সুতরাং এ সমস্ত বিষয় হতে সর্বতোভাবে নিবৃত্তিই বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য জানতে হবে।]

[ঈদৃশ ধর্মতত্ত্বানভিজ্ঞ যে-সকল অসাধু, জড়বুদ্ধি, সাধুত্বাভিমানী দুর্জন নিঃশঙ্কচিত্তে পশুহিংসা করে, পরলোকে নিহত পশুগণ ভোজনকারী হয়ে পশুমাংস ভোজিগণকে ভক্ষণ করে থাকে।]

তাপসপ্রধান বুদ্ধের যে করুণার কথা বৌদ্ধগণ বিচার করেন, তা' পূর্বকালেও ছিল, এটা ভাগবতেই দেখতে পাচ্ছি। "প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।" কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া---শারীরিক, মানসিক বা বাচনিক ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। যারা উদ্বেগ দেয়, তাদেরও উদ্বেগ পেতে হয়। এইজন্য ভাগবতে "যে ত্বনেবংবিদঃ" শ্লোকে দেখি---যারা এ-প্রকার জানে না, অথচ দাম্ভিকতা করে, 'আমি সব বুঝি, সব জান্তা বিচারে পশুবধে ব্যস্ত, তারা স্তব্ধ; তাদের বিচারে এমন জড়তা যে, "পশুবধ একটা শাস্ত্রীয় বিধান, আমরাও ধর্মকাজ করছি"---এই বিচারে সাহসের সহিত ধর্মের নাম করে পশুবধ করে। "শাস্ত্র যখন একথা বলছেন---শাস্ত্রীয়বিধানে পশুবধ করে তার মাংস খাওয়া দরকার, বৃথা মাংস খেতে হবে না, তা' হলে সাধু বলে অভিমান করতে পারা যাবে।"---অবশ্য রজস্তমোধর্ম প্রবল না হলে এই দুর্বুদ্ধি হয় না। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি পশুহিংসা করেন না। কিন্তু ওরা (রজস্তমোধর্মী) মনে করে, তারাও সাধু। ধর্মের নামে পশুবধ করে তার মাংস খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রচুর পরিমাণে চালান, ঠিক নয়। যেমন ভাগবীয় মনু বলেছেন---

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।।"

প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ স্বভাব হতে পরহিংসা করে। কিন্তু---

"দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্‌বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ।।"

(ভাঃ ১১।৫।১৫)

—এই শ্লোকটির বিচার তারা জানে না। সকল ঘটেই হরি আছেন। উপাস্য-উপাসক তফাৎ হবার জো নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁর সেবা করেন, তাঁরা দুইজন পৃথক নন। ভক্তের কার্য ভুলে গিয়ে যদি ভগবত্ত্বার কথাটা বলা হয়, তা' হলে বিচার সুষ্ঠু হল না। ভোগে চালিত হয়ে ভোগ-কার্যে ব্যস্ত হলে পরকায়ে বিদ্বেষ প্রবল হয়। অন্যের মাংস খেয়ে ফেলব, এ-বুদ্ধি ভাল নয়। ভগবানেরই সব মাংস, তিনি সব খেয়ে ফেলে দিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা; কিন্তু তাঁর অনুগত লোক খেতে পারেন না, তাঁরা ভোক্তা নন। সর্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা করতে হবে। এটা ভুলে গেলেই অসুবিধা। যেমন উপনিষদ্ বলেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ।।
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।।"

একটি বৃক্ষের দুটি জিনিষ—সেব্য-সেবক-ভাবপূর্ণ। যেমন দুটি দল নিয়ে একটি শস্য, দুটি অর্ধেক নিয়ে একটা পূর্ণ। একজন সেব্য, একজন সেবক আছেন। তাঁদের পক্ষী বলা হয়েছে। তাঁরা উড়তে পারেন, তাঁদের ভাল পক্ষ বা ডানা আছে। তবে তাঁরা যে উভয়ে জড়জগতের কার্য সমাধা করার জন্য উড়েন, তা' নয়। তাঁরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।"

—একজন পূজা গ্রহণ করেন, অন্যজন পূজা করেন। তাঁর পূজা নিয়ে অর্থাৎ তাঁকে পূজক সাজিয়ে নিজে তাঁর সেবাকার্য অনুমোদন করে নিজেকে তাঁর সেবকের সেব্য-বুদ্ধি করতে হয়। এই দুটি নিয়ে একটি কার্য। সেব্য-সেবকভাবটি লীলাবিকাশের পূর্ণতার কারণ। আমি ভোগ করব, ভগবান্ যোগানদার (Order-supplier) হবেন—ভোগের যোগান দেবেন, এ বুদ্ধি হলে ভোগী হতে হয়। কর্মীজ্ঞানীরা ভোগী, তাদের আত্মসুখবাঞ্ছা প্রবল, ভগবৎসুখবাঞ্ছা নাই। ভগবান্ সেবকের সেবা করুন, আমরা প্রভু হয়ে থাকি, এটা উল্টো বিচার। ভগবান্ এই বুদ্ধিটা নিরাস করেছেন—'সাধবো হৃদয়ংমহ্যম্' শ্লোকে। সাধুরা আমার সেবা করেন, আমি তাঁদের সেবা করে থাকি। সাধু ২৪ ঘটা আমার সেবা করেন, তাঁরা কুকুর, গরু, হাতী, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির সেবা করেন না, কেবল ভগবানের সেবা করেন। অপূর্ণ বস্তুর সেবার নামে যদি নিজে সেবাগ্রহণের ফিকির করি, আমার সেবা অন্য লোকে করবে তার একটা দাদন দিয়ে রাখি, তা' হলে ভগবানের সেবায় ঔদাসীন্য এসে গেল। ভগবানের সেবকগণই গুণবান্।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।"

যারা যতক্ষণ ভগবানের সেবা করে না, ততক্ষণ তাদের কোন গুণ স্বীকার নয়—কোনগুণই থাকতে পারে না। অনেকে বলেন, সুনীতিপরায়ণ লোক ভাল। কে বলে? —যারা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ চায় তারা। কিন্তু জগতের ধনাগারে এমন ধন নাই, যাতে সকলের সন্তোষ হতে পারে। কেউ পূর্ণ-জিনিষ দিতে পারে না, এটা আমরা ভগবানের বামনাবতারে বলি-বামন-সংবাদে জানতে পারি। দাতার কাছে তত জিনিষ নাই, গ্রহীতা যত চায়। তা' হলে আমি দয়া করতে পারি, পরার্থিতাধর্মে দীক্ষিত (altruist) আমি, এ প্রকার দম্ভ আমার ভাল নয়। ভগবান্ বামনলীলায় এই শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রুতির বাক্য যেটি পাঠ করলাম, তাতে বলেছেন, একটি গাছে দুটি পাখী আছে, একটি খায় আর একটি খাওয়ায়। ভোগী পাখী যখন খায়, যখন প্রভু হবার আকাঙ্ক্ষা করে, যখন ভোগে ডুবে যায়, তার মনে যদি এই কথাটা উদয় হয়,—তিনি আমার প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারের সব জিনিষ আমাকে দিচ্ছেন, যিনি ভোগ করাচ্ছেন, আমি তাঁর কি সেবা করছি, তখন তার সেবা করবার বিচার আসে। "অনীশা"—যে ভোগরাজ্যে ডুবে গেছে, বলছে, "খানেওয়ালা আমি, সেবা করনেওয়ালা তিনি, ভোগকর্তা আমি, ভোগদাতা তিনি; আমার প্রভু কেউ নাই"—এই প্রকার দুর্বুদ্ধি হলে তখন কেবল 'দেহি' 'দেহি' রব। "রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দিশো জহি, মনোরমাং ভার্যাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" ইত্যাদি বাক্যে সপ্তশতী পাঠকালে আবেদন করি। তিনি যোগান দেন আর আমি ভোগ করতে থাকি। "আমি শালগ্রামের উপর বসে গেছি, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাচ্ছি, শালগ্রাম আমার চাকরী করুক"—এই বিচার-প্রণালীটাকে 'ধর্ম' বলে চালান কি ভীষণ সেবা-বিরোধিতা বা মূঢ়তা! যেহেতু প্রভু-সেবা-বঞ্চিত হয়ে প্রভুকে আমার ঘোড়া করে ফেলেছি, সে আমাকে চিরদিন চড়াবে, ভক্তদের চাকর করে ফেলবো—এই বুদ্ধি হলে অসুবিধা আসে। কারো আশ্রয়ে না থাকায় প্রাপ্ত দ্রব্য হারাবার সময় শোক—অভাব এসে উপস্থিত হয়, মূঢ়তা লাভ হয়। প্রভুর সেবা না করে ভক্তিহীন হয়েছি, ভজনীয় বস্তুর প্রতীতি নষ্ট হয়েছে। অথচ দুইটি একসঙ্গে না থাকলে পূর্ণ হয় না। যখনই মাথায় ঢুকবে যে আমি সেবা নিচ্ছি, আমি ক্ষুদ্র, বৃহতের সেবা করা আমার কর্তব্য, তিনি আমার প্রভু, তখন তাঁর মহিমা জানতে পারলে শোক থাকবে না। শোক হয় প্রাপ্তবস্তুর অভাবে, যখন প্রাপ্তবস্তু ধ্বংস হয়। ভোক্তৃভোগ্য-বিচারহীনতাই দুর্বুদ্ধি। 'বীতশোক' কখন হয়? যখন জানে, সব ভোগ তাঁরই, তিনি সেবা নেবেন, আমি তাঁর ভোগ্য। এই মহিমা-জ্ঞান আগে হচ্ছিল না। দুজনে বন্ধু—সর্বতোভাবে পরস্পর সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত (reciprocated) হলেও, একের জন্যে অন্যে ব্যস্ত হলেও তিনি খাওয়াচ্ছেন, আমি খাচ্ছি—এই বিচার ছিল না। যখন বুঝতে পারি, তখন বলি—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।"

আপনি দাতা, আপনি কৃপা করে খেয়ে উচ্ছিষ্ট দিন—এই বিচার হলে তখন আমরা ভক্তি লাভ করতে পারি।

আমি আমার জন্যে কাজ করে সুবিধা সঞ্চয় করবো, এটা পুণ্য, এর বিপরীত পাপ। যখন দেখতে পায়, মূলবস্তু তিনি, কর্তা তিনি, আর আমি কর্ম, কার্যের দ্বারা কর্তার অভীষ্ট সাধন করবো; তিনি ব্রহ্মযোনি, বৃহদ্বস্তুর মূল আকর-বস্তু, সর্বকারণকারণ, তিনি ওয়াকিবহাল হয়ে, মুক্ত হয়ে, জগদ্দর্শনকার্য সমাধা করে পাপ-পুণ্যের বোঝা ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন—নিষ্পাপ হয়। পরম সমতা এসে যায়, বাস্তবিক পণ্ডিত হয়ে যায়। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ"। স্বরূপের অভিব্যক্তি হলে সেবা-কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে। তখন অন্যের সেবা, কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের সেবা করবে না। তবে ভক্তের সেবা করবে কেন? এ প্রশ্ন হলে বলতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেব্য পদার্থ। তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে পড়েছেন তাঁর সেবার জন্য। তাঁর (সেবকের) সেবা না করে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হবে না।

মানুষকে পুণ্যবান বলে প্রশংসা বা পাপী বলে ঘৃণা করতে হবে না, করলে অসুবিধা আছে।

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।"

সমতা লাভ না করলে সুবিধা হবে না।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।"

পাণ্ডিত্য হবে সমদর্শী হলে। সকলের উপকার করবো—এ বুদ্ধি হলে হিংসার অবকাশ থাকে না। সকলে বেশী সেবা করছে, আমি পারছি না—এই বিচার হলেই সুবিধা। 'আমি বড়' এটা অনর্থপ্রণোদিত বুদ্ধি। 'অন্যলোক তাঁবেদার, আমি প্রভু'—এটা অধঃপতনের কারণ। যে মঙ্গল চায়, সে তৃণাদপি সুনীচ হয়ে সকলকে সম্মান করবে। ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছা থাকলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" বিচার অনুধাবন করতে হবে।

Ellipse-এর দুটো focus, একটি নিকটের আর একটি দূরের blind focus. যে focus-টা বৃত্তাভাসের পরিধির নিকট পৌঁছায়, সেটা ঢের দূর। মানুষ empiricism-এর দ্বারা অনেক দূরে পৌঁছাবে মনে করে; কিন্তু যে পরিধিটি নিকটে থাকে, একটু ছেড়ে দিলেই সেটা পাবে—যেটুকু মানুষের আছে, সেটা ছেড়ে দিলেই পাবে। কতকগুলি মানুষ মনে করে, খুব বেড়ে গিয়ে পরিধির নিকট পৌঁছাবে—ব্রহ্ম হয়ে যাবে, কিন্তু বেড়ে গিয়ে ব্রহ্ম হবার পিপাসা দুর্বুদ্ধি মাত্র। মানুষের কতটুকু আছে? ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দেওয়া সহজ; কিন্তু অভাব পূর্ণ করতে গিয়ে ফলাবটি করে জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার জন্য ব্যস্ততা অবিবেচনার কার্য।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ।। (ভাঃ ৬।৩।২৫)

—এই বিচারে অভাব পূরণ করে নেব—জ্ঞানের অভাব, শক্তির অভাব, অর্থের অভাব দূর করে প্রচুর জ্ঞান, অর্থ, শক্তি সঞ্চয় করে বড় হব। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, তোমার কতটুকু আছে? আর কতটা অভাবই বা পূর্ণ করবে। তার থেকে তোমার যা' বিন্দুমাত্র আছে, সেটুকু ছেড়ে দাও না কেন? ভোগীর চেহারায় বিশ্বদর্শন-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছেড়ে দাও—অভিমান-শূন্য হও। যে যা চায়, তাকে তা দিয়ে অমানী হয়ে যাও। তা' হলে অল্প প্রয়াসেই কার্য্য হবে। যদি সহ্য করতে পার, কে তোমার কতটুকু অন্যায় করতে পারবে? সমতা লাভ করে ঝগড়া করলে বড় হবার চেষ্টা আছে জানতে হবে। বাকিটুকু পূরিয়ে নেবার চেষ্টা না হওয়াই ভাল। অনেকটা সুবিধা হবে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা হয়। যোগসিদ্ধি, কর্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গসুখাদির চেষ্টা প্রভৃতির নিরর্থকতা সহজেই জানা যায়।

একটি বৃক্ষে দুটি জিনিষ, সেবকের রস একপ্রকার, সেব্যের রস অন্য প্রকার। সেব্য সেবা গ্রহণ করে সেবককে সেবার সুযোগ দেন; ভগবান্ সেবকের সেবা করেন, সেবক ভগবানের সেবা করেন। একটা কথা আছে—'শিবের গুরু রাম,

রামের গুরু শিব'; 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভুই শ্রেষ্ঠ, তাঁর আরাধ্য রামচন্দ্র। যেমন কথা আছে 'রামেশ্বর'। রাম ঈশ্বর যাঁর অথবা রামের ঈশ্বর যিনি। 'মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি'—অভক্তসম্প্রদায়ের তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে কু-ব্যাখ্যা করে অর্থবিপর্যয় করে। তারা চৈতন্যদেবের উপদেশ হতে পৃথক থাকে। তিনি কৃষ্ণভজনের কথাই বলেছেন, তাঁর উপদেশ না বুঝলে বিপথগামীই হব। রসময়ের রসবৃদ্ধির যত্ন করা কর্তব্য। রস শুকালে জড়রস বৃদ্ধি করলে সর্বনাশ।

রস-বিচারটি সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিকশেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ করে রসাস্বাদন করছেন, এটি বিচার করলে আমরা জানব—'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।' সব রস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তার কতক স্বাংশগণে আছে, এঁদের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁরা কোন কোন রস কি ভাবে আস্বাদন করেছেন, তা' জানা দরকার। করুণাবতারের কথা বুঝতে না পেরে যে অমঙ্গল, তা' হতে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার—কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধতে ভাল গুণ। ভোগীর ভোগ তাদের জন্য রেখে দিয়ে তিনি নিজে নির্ভোগ হয়েছেন। এটি ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে গাছতলায় বসে তপস্যা করেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হয়ে নিজ বহু কামনা তৃপ্তি করেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আসামীদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধকেই রায় দিলাম। তার উত্তর নারদঋষি দিয়েছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।।

কৃষ্ণের লীলা বুঝতে না পেরে বুদ্ধকে তপস্বিমাত্র বুঝলে—কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না করলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার বিচারটারই বহুমানন হয়। অন্য সব নিষ্ক্রিয় হলে ভোগী সব মজা লুটবে। এদের পাষণ্ডতা কত বেশী! সাধুরা জঙ্গলে থাকুক,

আমরা ঘরে বাস করে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করব, তাদের সাধুতার কথা আমাদের কাছে না আসুক। ভোগ করে কৌশলে লোক ঠকান। অনেকে বলেন, গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদন বড় হবে কেন? তা' থেকে আমাদের বেশ্যালয় বড় হল না কেন? মোটরগাড়ীতে আমরা চড়ব—কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে এঁদের চড়ে কাজ নেই, কৃষ্ণ নিরাকার বুদ্ধ হয়ে জঙ্গলে যান; কিন্তু বুদ্ধিমান নারদ বলেছেন, হরির আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হোক, নচেৎ তপস্যা, ধর্মকর্ম প্রভৃতির নামে শয়তানেরই প্রশ্রয় দেওয়া হবে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। বুদ্ধিমানের কর্তব্য সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। ভক্ত ভোগ করেন না, ত্যাগও করেন না, ভগবানের ভোগ দেন, কিন্তু বোকা লোক তা' বুঝে না। যে মুহূর্তে 'আমি ভোগ করব, বুদ্ধি হয়, তখনই ভক্তি থেকে খারিজ হয়ে ব্যভিচাররত, অসৎ হয়ে পড়ে। ভোগের দ্রব্য মাঝ পথে মেরে নেবার বুদ্ধি হলে সর্বনাশ। রসের একমাত্র ভোক্তা—ভগবান্, সুতরাং আমার তপস্বী জীবন হওয়াই ভাল। 'অন্যান্য সকলের জীবন দিয়ে ভগবানের সেবা করব এই বিচারই ভাল। শুধু তপস্যা করার কোন মূল্য নেই। যেমন—এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসালে দশ দশ গুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাদ দিলে সব শূন্য; তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা কিছু করা যায়, সবই নিরর্থক হয়ে যায়; সুতরাং বৌদ্ধদিগের বিচারের সহিত ভক্তসম্প্রদায়ের বিচার পৃথক।

যেমন বরাহ-উপাসকগণ 'বারাহী', নৃসিংহ-উপাসকগণ 'নারসিংহী', রামোপাসক 'রামাৎ', কৃষ্ণ-উপাসক 'কার্ষ্ণ' বলে উক্ত হন, কিন্তু তাঁরা সকলেই বৈষ্ণব; কিন্তু বুদ্ধের উপাসকগণ বৌদ্ধগণকে কেন বৈষ্ণব বলা হয় না? তার উত্তর এই যে—বুদ্ধকে তারা বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করে না, তিনি একজন সাধক, তপস্যা করে সংযত হয়ে কষ্টমুক্ত হয়েছে—এই প্রকার বিচার করে। তারা জানে না, যে তারা নিজে বৈষ্ণব। সুতরাং তাদের কর্মের সফলতার বদলে নিষ্ফলতা আসে। তপস্যা ত ভগবৎসেবার জন্যই করতে হবে।

নেহ যৎ কর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।

অচেতনের সেবায় কি ফল? বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলা বুঝতে না পেরে বুদ্ধদেবে যে কারুণ্যরস আছে, তার বহুমানন করে। বুদ্ধের করুণা-বিস্তার ভাল কথা, কিন্তু তুমি করুণা গ্রহণ করছ না কেন? বুদ্ধকে তপস্বী মাত্র দাঁড় করাও কেন? তিনি যে তপস্যা করে জগতে করুণা বিতরণ করেছেন, সেটি মূল বস্তুর উদ্দেশ্যে পরিচালিত করবার জন্য। বুদ্ধের বিচারপ্রণালীতে হরিভজনই আছে, কিন্তু অবুঝ বৌদ্ধগণ তপস্যার নিরর্থকতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করেছেন, তাতে সবই বিফল—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।

এই প্রকার প্রত্যেক অবতারের যে যে রস আছে, তা' বিচার করলে জানতে পারব, সব রস অপেক্ষা কৃষ্ণের রসের উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণে ১২টি রস পরিপূর্ণভাবে আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। সেই রস পান করা দরকার, এটি প্রয়োজন-তত্ত্বে বিচার করা হয়েছে। মায়িকরস, জড়রস আংশিক বা অপূর্ণ, সেটা ফলপ্রদ নয়।

দ্বাদশ দিবস

(৩-৯-৩৬)

যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং

দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।

ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ

ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।

সেই কোন এক পুরুষোত্তম বস্তুকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয়-লীলা-বৈচিত্র্য-প্রদর্শন-কল্পে জলধিকে স্বীয় শল্ক-সীমায় লীন করিয়েছিলেন (মৎস্যাবতার), যাঁর পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডল সংলগ্ন হয় (কূর্মাবতার), যাঁর দন্তে পৃথিবী (বরাহাবতার), যাঁর নখে হিরণ্যকশিপু বিলীন হয়েছেন (নৃসিংহাবতার), যাঁর পাদপদ্মে দ্যাবা পৃথিবী বিলীন আছে ('ত্রেধা নিদধে পদম্' বিচারে বামনদেব), যাঁর ক্রোধে ক্ষত্রপ্রকৃতি ব্যক্তিসকল বিনষ্ট হয়েছিল (পরশুরামাবতার), যাঁর শরে দশানন রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (রামাবতার), যাঁর পাণিতে প্রলম্বাসুর নিহত হয়েছিল (শ্রীবলদেব), বিশ্ব যাঁর ধ্যানে বিলীন (বুদ্ধাবতার), আর যাঁর অসিতে অধার্মিককুল বিনষ্ট হবে (কল্কি)। সেই মৎস্যকূর্মাদি অবতারের অবতারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। এই শ্লোকটি শ্রীজয়দেবের "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোকের সঙ্গে একতাৎপর্যবিশিষ্ট।

কপটতা করার দরুণ বলদেবের দ্বারা প্রলম্বাসুর বধ হয়েছিল। যেমন বুদ্ধ তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি করে সমগ্র বিশ্বের সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণামূর্তির প্রকাশবিশেষ হয়ে শোকরতির সামগ্রীযোগে সর্বত্র সমদৃষ্টি হয়ে পশু-হিংসাদি বাধা দিয়েছিলেন, সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রলম্বাসুরকে ধ্বংস করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন, বরাহদেব পৃথিবী ধারণ করেছিলেন, কূর্মদেব মন্থনদণ্ড মন্দারপর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করে কণ্ডুয়ন-জন্য সুখানুভূতিক্রমে নিদ্রালু হন, নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার

করেছিলেন। সেই দেবতাটি কৃষ্ণই; নিমিত্ত উপলক্ষণে বিভিন্ন রস প্রকট করে ভিন্ন ভিন্ন নৈমিত্তিক অবতারোচিত বৈভব-লীলা প্রকাশ করেছেন। হয়গ্রীবাসুর কর্তৃক অপহৃত বেদ জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন, মাছের আঁইসে জলধির জল শুকিয়ে গেল, তাতে বেদ উদ্ধার হল। সত্যব্রত রাজার সময়ে কৃতমালা নদীর ধারে দক্ষিণ দেশে মৎস্যাবতারের প্রকট-লীলা রাজাকে ঔষধি ও নৌকাদানে প্রলয় হতে রক্ষা করেন, অর্থাৎ স্বর্গ প্রমুখ বিশ্ব জড়রসে নিমগ্ন ছিল, তাকে পৃষ্ঠে ধারণ করে দেবপ্রাপ্য দ্রব্যাদি দান করেছেন।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডুয়না-

নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।

যৎসংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং

যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।

(ভাঃ ১২।১৩।২)

[পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত-সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজল-রাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্তমান রয়েছে—কখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না।]

ভাগবত ১২শ স্কন্ধের সেই বিচারে মন্দাররূপ জগন্মণ্ডলকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। জগৎ আলাদা ছিল না, ভগবৎপৃষ্ঠে লীন হয়েছিল, বামনদেব দ্যাবা-পৃথিবীকে পদদ্বারা আক্রমণ, রামচন্দ্র রাবণকে শরদ্বারা আঘাত করেছিলেন; আর কল্কি অধার্মিককুলকে অসিদ্বারা বিনাশ করবেন। চার যুগে এই দশ অবতার। অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'।

এই বিচারে সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা পাই। তাঁতে বিশেষ রস মধুররসের বিচার পাই। তদন্তর্গত সকল রস। অন্য কোন লীলায় এই রসটি পাই না। বৎসল রসের বিচার কিছু কিছু পাই রামচন্দ্রে। যেমন দশরথ রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন, কৌশল্যা প্রধানা মহিষী

হলেও তিনি কৈকেয়ীর প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ বাৎসল্য-রসসেবা হতেও ন্যূনাধিক বঞ্চিত হলেন; এখানে আপনারা বেশ বিচার করে দেখবেন, নন্দের বাৎসল্য কি প্রকার। নন্দ স্বীয়নন্দন কৃষ্ণে কিরূপ আসক্তি ও সেবাপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। দশরথের রামসেবা আর বসুদেব-নন্দের কৃষ্ণসেবা এই দুইটির তুলনা করলে দেখা যায়, দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞা—নিজবাক্য-রক্ষণার্থ প্রিয়পুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামকে রাজ্য হতে অবসর দিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন—

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নির্দেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্য্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ।।

কিন্তু নন্দ তা' করেন নি। যখন অক্রূর কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন, সেই সময় নন্দ কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কতই না যত্ন করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন (পরবর্তী সময়ে স্যমন্তপঞ্চক হতে আগমন ব্যতীত আর ব্রজে আসেন নি), নন্দ কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে আনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দশরথ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য দশরথ রামের জন্য নিজ প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু বাৎসল্য-রসের কি পরিমাণ ক্ষতি হল, সাধুগণ বিচার করুন। নন্দের ও দশরথের বাৎসল্য আলোচনা করলে দেখা যায়—দশরথ বিধিবাধ্য হয়ে রামকে সিংহাসন হতে অবতরণ করিয়ে বনে পাঠালেন, আর নন্দ ব্রজে বাৎসল্যরসে সর্বতোভাবে পুত্র-সেবায় যত্ন করলেন। তা' হলে রামচন্দ্রের উপাসনাকারী দশরথ রামসেবায় বিচলিত হন, কিন্তু নন্দের কৃষ্ণসেবায় আদৌ বিচলন দেখা যায় না। অনেকে মনে করেন, বৎসল-রসের ব্যাপার ত' রামচন্দ্রেও আছে, এখানে রসের বিচার আলোচ্য।

কৃষ্ণ দ্বাদশরসের একমাত্র আশ্রয়। কেউ বলেন, রামই ত' কৃষ্ণ, তখন রামের উপাসনাতেই কাজ মিটিবে; কিন্তু দেখুন, দণ্ডাকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষি বহুকাল তপস্যা করে রামের অপূর্ব রূপলাবণ্য ও অগণিত গুণগান দর্শনে প্রোৎসাহান্বিত

হয়ে যখন বিচার করলেন, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আলিঙ্গন করাই কর্তব্য —মধুররতি-বিশিষ্ট হয়ে তাঁকে পেতে পারলেই ভাল, তদুত্তরে সর্বরসাশ্রয় রামরূপী কৃষ্ণ বললেন—'আমি একপত্নীধর, আমার দ্বিতীয়পত্নী গ্রহণের উপায় নেই, কেননা সীতা একপতিব্রতা'। সীতা রাবণের যত্ন-মধ্যে প্রবিষ্ট হন নি। শূর্পনখা প্রভৃতি যখন রামের নিকট সেই রকম বিচারে আগ্রহান্বিত হয়েছিল, তখন রামচন্দ্র তা'দিগকে স্বীকার করেন নি, কেননা তাঁর (রামচন্দ্রের) একমাত্র পত্নী সীতা, সুতরাং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণকে তাঁর প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। তখন পুরুষশরীর তাপসগণ জন্মান্তরে স্ত্রীদেহ—গোপীগর্ভে জন্ম লাভ করে কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ করেছিলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যদি কোন আত্মা ঐ প্রকার বিচারে ভগবানের সঙ্গে মধুররতিতে আগ্রহান্বিত হন, তাঁর নিত্যা সুপ্ত-প্রকৃতি উদিত হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, তাঁকেই পাওয়া দরকার, তবে পুনরায় ফিরে গিয়ে গোপীগর্ভে নিত্যজন্মলাভ করে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হবে,—তাপসদেহ বা অন্য কোন অনিত্য দেহে তাঁকে পাবার উপায় নাই। রামচন্দ্র সেই তাপসদেহকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। মধুর রতিতে এই যে চিত্র, সেই প্রকার বৎসলরতি-বিচারে যদি কেউ বলেন যে, দশরথ রামকে সেবা করে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন—তাতে বিচার এই,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।

কতকগুলি লোক বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যস্ত, কেউ স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনায়, কেউ মহাভারত-শ্রবণে ব্যস্ত, এঁদের সকলেরই বিচার—'আমরা ভবার্ণবে ডুবে যাচ্ছি, এ হতে রক্ষা পাওয়া দরকার, কিন্তু শুদ্ধ বাৎসল্যরস-রসিকের বিচার এই যে,—আমি সেই নন্দেরই বন্দন করি, যাঁর অলিন্দে স্বয়ং পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি (ভবভয়ে ভীত হয়ে) বেদ, স্মৃতি, মহাভারতাদি শুনতে যাব না সংসারকষ্ট থেকে নিবৃত্তির জন্য কেউ স্বাধ্যায়নিরত হন, কেউ বা স্মৃত্যাদির অনুশীলন করেন, তাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে ভাগবতকথা ভোগময়কর্ণে বিকৃতভাবে শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম,

মোক্ষ এই চতুর্বর্গ পর্যন্ত; পঞ্চমবর্গের কথা---একমাত্র ভগবানই প্রীত হউন, বিচারে তাঁদের চেষ্টা নেই। আমার সুবিধা হউক আর ভগবানের কেবলমাত্র সুখ হউক এই বিচারদ্বয়ে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। একজন ভক্ত, আর একজন অভক্ত। অভক্ত সর্বদা 'নিজের' সুবিধা খোঁজেন, 'আমি ধার্মিক সাধু হই, আমার কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হউক'----এই সমস্ত বিচার করেন। সূর্য্যের নিকট থেকে ধর্ম, গণেশের পূজা করে অর্থ, শক্তির নিকট হতে কামনাপূর্তি এবং রুদ্রের নিকট হতে মোক্ষ আদায় করাই তাঁদের বিচার। চার জনের নিকট থেকে আদায় করব, কিন্তু তাঁদের দেব কি? না, কপটতা, যদি আদায়ের ব্যাঘাত কর, তবে পূজা ছাড়ব; কিন্তু বিষ্ণুপূজা সে রকম নয়, আমরা আদায় নেবার পরিবর্তে তিনিই আমাদের সর্বস্ব আদায় করে নেবেন, তিনি কামদেব। অন্য দেবতার কাছে কেবল আদায় নেবার জন্য পূজার নামে কপটতা করা কামকামীর কার্য, কিন্তু ভক্তের কৃত্য কামদেব বিষ্ণুর কামনাই পরিতৃপ্ত করা। একজন সেব্যের সেবা কিসে হয় তার জন্য ব্যস্ত, আর অপরে 'সেবক' নাম নিয়ে তাঁদের কল্পিত সেব্যের পকেটে হাত দেবার জন্য ব্যস্ত। শিবাদি-পূজার ছলনা করে কিছু আদায়ের চেষ্টামাত্র; কিন্তু "যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ"—শ্লোকে ভগবান্ বলছেন---"এঁরা অবিধি অর্থাৎ অন্যায়পূর্বক আমাকে চাকর করে নিজেরা প্রভু হবেন, আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবেন, কিন্তু আমি সেয়ানা, আমি আদায় নেব, তাঁদের দিয়ে সেবা করিয়ে নেব। আমার ভক্ত আবার আমা অপেক্ষা চতুর, তারা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমি অভক্তকে আমার মূর্তি দেখাই না, অন্য মূর্তি প্রকট করি।" ভক্তসকল প্রভুকে সেবা করেন বলে প্রভু নিজের মূর্তি বদল করেন না, কিন্তু অভক্তের নিকট ভগবানকে যাত্রাদলের সাজ পরার মত কাপড়-চোপড় পরে অন্য দেবতার চেহারা করতে হয়।

নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম, বামন, নৃসিংহাদি সবই বিষ্ণুদেবতা। অন্যদেবতা ---বিষ্ণু নহেন যাঁরা; তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু চাই,---যেন খাজাঞ্চী করে ফেলি; যেমন ব্যাঙ্কে টাকা রেখে চেক্ কেটে টাকা বের করে নিই, টাকা দাদন দিয়ে তা আবার সুদ সমেত আদায় করি---সেই রকম আমাদের যে ভগবানকে নমস্কারাদি দাদন দেওয়া, তাও তাঁর থেকে কিছু আদায় করে

নেওয়ার ফন্দি। 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি 'দেহি' 'দেহি' করে কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে নেই, তাঁর (ভগবানের) ভক্তবাৎসল্য-বিচারে অনুমোদিত যা আকাঙ্ক্ষা, তাই পূরণ করাই ভক্তের বিচার। অভক্তেরা বলছেন গণদেবতা ঈশ্বর। গতকল্য গণেশচতুর্থী গেল, বাংলাদেশে গণেশের পূজা খুবই কম, এখানে কেবল দোকান-ঘরে অর্থসিদ্ধির জন্য গণেশমূর্তি দেখা যায়, কিন্তু উৎকল দেশে ও বোম্বাই প্রভৃতি পাশ্চাত্য অঞ্চলে গণেশের পূজা খুব বেশী।

চার প্রকার দেবতার পূজার বিনিময়ে সেবককে সেব্যের জন্য নিত্যকাল সেবাই দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের অন্যরূপ সেবা সেবকের ইন্দ্রিয়তোষণ মাত্র। অন্য-দেবতা-পূজকের সেবা-চেষ্টা-প্রদর্শন কেবল ছলনামাত্র, বণিকের দোকানে জিনিষ কিনতে গেলে যেমন 'ফেল কড়ি মাখ তেল' বিচার---সেইরকম। ধর্মাদি চতুর্বর্গকামী যখন মহাদেবের পূজা করেন, তখন মুক্তিকামী হয়ে 'শিবোহহং' 'শিবোহহং' বলেন, তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাব---এই রকম বিচার করেন, ওকেই তাঁরা মঙ্গলপ্রাপ্তি বলে মনে করেন। মোক্ষকামীর---মুমুক্ষুর এই প্রকার চিন্তাস্রোত। বুভুক্ষা হতে আর তিন প্রকার (গণেশ, শক্তি, সূর্য) দেবতার পূজা। প্রার্থনার প্রার্থী আমরা, তাঁরা (দেবতারা) আমাদের সেবা করেই খালাস। আমরা যেমন বলে থাকি 'আপনার কি সেবা করতে পারি? আমার প্রতি কি আদেশ হয়? বলুন'---এই প্রকারে তাঁরা যেন আমাদের (প্রার্থীর) আদেশ-প্রতীক্ষায় থাকেন। ভগবদ্ভক্তের ঐ রকম কৈতবময়ী প্রার্থনা নেই। ভগবান্ কামদেবের প্রীতিই তাঁদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। পঞ্চোপাসনার প্রণালী ভাগবতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়েছে। পূর্বে একমাত্র একক বিষ্ণু নারায়ণই ছিলেন---"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ"---ব্রহ্মরুদ্রাদি ছিলেন না। তাঁ (ভগবান্) থেকেই এই দুটি মূর্তি প্রকট হয়েছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে জগৎ প্রকাশ এবং মহাদেবের দ্বারা বিনাশ হয়।

অন্যদেবতার পূজা করতে হলে শালগ্রাম এনে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠা সাহায্য বিধান করে থাকেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব না হলে ভক্তিরস লাভের সম্ভাবনা থাকে না; সেই রসবিচারে দেখতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্তি, একমাত্র আকর্ষক।

অন্যান্য অবতারগণ তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে থাকেন, যাঁরা অন্যায় ভোগে ও ত্যাগে প্রবৃত্ত থাকেন না, তাঁদের তিনি আকর্ষণ করেন।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন, ভগবান্ আমার পতি হউন, তা' হলে রামের উপাসনা-দ্বারা তাহা হয় না, কৃষ্ণের উপাসনা করতে হয়। যেমন অনূঢ়া গোপীগণ বলেছিলেন----

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ।।

---দেবীর কাছে ইতর কামনা না করে কৃষ্ণকামনার বিচার আমরা অনূঢ়া গোপীগণের চিত্তবৃত্তিতে লক্ষ্য করি। আমরা ঐরকম মহাদেবের পূজার সময় বলে থাকি,----

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে।।

হে গোপেশ্বর, তুমি বৃন্দাবন নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত বর্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্রাকৃতি তিলক, সনক, সনন্দন, নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা করে থাকেন। ('বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে) তিনি একমাত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক বলে সনকাদি সাতজন তাঁর পূজা করে থাকেন---(সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি সপ্তমূর্তি)। ভগবানের পূজা করতে হলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বিচারে সর্বাগ্রে মহাদেবের পূজা করতে হয়। বদ্ধজীবগণ মহাদেবের পূজা করতে পারে না, একমাত্র মুক্তপুরুষই সুষ্ঠুভাবে তাঁর পূজা করতে পারেন। সেই মহাদেব সর্বক্ষণ রামনামগানে মত্ত, ভগবান্ ও মহাদেবের পূজা পৃথক ঈশ্বরবুদ্ধিতে করতে হয় না। সকল দেবতা ভগবানেরই আশ্রিত, তাঁর পূজা করলেই সকল দেবতার পূজা হয়ে যায়। জীব যখন উপাধিশূন্য হবে, স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তাঁর দ্বারা নিত্যকাল কৃষ্ণ-উপাসনা হবে।

তা' হলে লোকে বলতে পারে যে, তবে কি কেবল বিষ্ণুর উপাসনাই হবে, অন্যান্য দেবতাগণ কি নষ্ট হয়ে যাবে? তা' নয়, সব দেবতা ভগবান্‌কে আশ্রয় করেই রয়েছেন, সকলেই ভগবানের আশ্রিত এবং সকলেই ভগবানের পাদপদ্মেরই উপাসনা করেন।

যথা----'তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।' বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবা না করা পর্যন্ত আমাদের অপবিত্রতা থাকে, ভোগের ভাব আসে, যেটা কর্মাধিকামী লোকের কামনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তাঁরা কেবল কৃষ্ণসেবাই করতে চান, তার বিনিময়ে কিছু চান না----

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।

ভক্তের পদবী সামান্য নয়, তাঁরা খুব প্রকাণ্ড বা তাঁরা এখানকার কোন লোভে লুব্ধ হন না, অভক্তগণ ভক্ত হবার ছলনায় যে বিট্‌লেমি করে, সেটা ভক্তি নয়। চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ-সেবা করার বুদ্ধি যাঁদের, তাঁরাই সেবক।

পরমনির্মৎসর হয়ে উরুক্রমের নিত্য সেবার সহায়তা করাই নিত্যা ভক্তি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাসনা থাকাকাল পর্যন্ত ভক্তি হয় না। ভক্তির চেহারা বটে, কিন্তু ভক্তির বিরুদ্ধ বিচার। তারা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে সর্বদা বিষয়-ভোগে দিন কাটাচ্ছে, তাদের ভক্তির সঙ্গে কোন সংস্রব নেই; তা' হলে শরীর থাকার দরুণই কি ভজনে অযোগ্যতা আছে? তা নয়, ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অপব্যবহার হচ্ছে, তা না হলে তার দিকটা পরিবর্তন করতে হবে। নাস্তিকই বলুন, অন্য দেবপূজকই বলুন, সকলেরই দর্শন ভিন্ন। চতুর্বর্গাভিলাষীর দর্শন অন্যরূপ; তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কামের জন্য সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির পূজা এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টি অন্য প্রকার। পঞ্চোপাসনার মধ্যে সেবার নামে যে চতুরতা, তাঁদের গীতার গীতে 'যজন্তি অবিধি পূর্বকম্' বিষয়টা জানা থাকলে ঐ প্রকার বিচার হত না। সেবার নাম করে চতুরতা ঠিক নয়। যেমন ঠাকুরঘরে চোর বিষ্ণুপূজা করতে না ঢুকে বিষ্ণুপূজার উপকরণগুলি নিয়ে সরে পড়ে, সেই প্রকার ভোগিসম্প্রদায়ের বিচার। ভোগের জন্য ভগবানের পূজা হয় না, ভগবান্ কেবল সেবা নেন। প্রহ্লাদ বলেছেন----

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নিবদ্ধাঃ।।

যারা মায়া-দ্বারা আবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণকে কেবল মেপে নেওয়া ধর্মে নিযুক্ত রেখেছে, তারা বিষ্ণুকে স্বার্থগতি বলে জানে না। যা কৃষ্ণ নয়, সেইসকল বস্তু ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করে তারা দুরাশয়যুক্ত। দুষ্ট আশয়, অসতী বুদ্ধি নিয়ে অন্যায়রূপে ভোগে নিযুক্ত। চক্ষু দিয়ে ছবি, সিনেমা দেখবে, রঙ্গালয়ে যাবে; কাণ দিয়ে গান শুনবে, কিংবা রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল্ নিয়ে প্রশংসার কথায় ব্যস্ত থাকবে—এরকম করে সময় নষ্ট করা কর্তব্য নয়, বাইরের দিকে অর্থচেষ্টা প্রয়োজন নয়, ওটা ভবঘুরের ব্যাপার। পৃথিবীতে যা আছে, সেটার জন্য ব্যস্ত হওয়া দিল্লীর লাড্ডুর মত, 'যো খায়া সো পস্তায়া, যো নেহি খায়া সোভি পস্তায়া'। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার ঠিক নয়, দুয়েরই অসুবিধা আছে। দুরাশয় ছেড়ে সদাশয় হতে হবে, সৎ—বিষ্ণু, তাঁতে আশয়যুক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার কামনা, তা না হলে দুষ্টাশয়—বিষ্ণুর প্রভু হবার চেষ্টা। আমরা বাইরের প্রয়োজনকে আয়ত্তাধীন করার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, কেন হয়েছি—অন্ধকে গুরু করেছি বলে। একজন অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের হাত ধরে নিয়ে গেলে দু'জনেই খানায় পড়ে, সেইরূপ কর্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু প্রভৃতি বাস্তবিকই অন্ধ; কোন জিনিষটা দেখবে, কে দেখবে—এ সমস্ত বিচার হয় না বলে অন্ধ।

তারা ঈশতন্ত্রীতে বদ্ধ। ঈশতন্ত্রী—ঈশ্বরের তন্ত্রী—টানা ও পড়েন, দুটো সুতা দিয়ে কাপড় বুনা হয়, ঐ রকম বেদরূপ রজ্জুতে মানুষ বেশ করে আষ্টেপিষ্টে বদ্ধ হয়ে অসুবিধায় ঢুকে পড়েছে, তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। কৃষ্ণকে ভজন না করে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, গৃহপতির সেবা না করে গৃহপতি হয়ে পড়ে গৃহব্রত হচ্ছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

—গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়, যাতে সংসারটা হয়। সমাবর্তন করে তাতে ব্রত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ত্রিদণ্ড্যগ্রণী প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা নিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্যাসীদ্রসঃ।।

আমরা এ জগতে রকম রকম রস পেয়ে গেছি। পণ্ডিতেরা কে কত পণ্ডিত, এই বলে বৃথা তর্ক-বিতর্ক করে দিন কাটাচ্ছেন। গৃহব্রতগণ স্ত্রীপুত্রাদি কথায় বড় আনন্দ লাভ করছেন। "তনয়ো হি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দদায়কঃ" বিচার হয়েছে। কর্মী, জ্ঞানী, যোগী এই প্রকার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করলেন, তখন ঐ সব জড়রস থেমে গেলে, ভক্তিরস প্রবল হল। সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য বিচার্য হলে অন্যান্য কর্তব্য থাকে না। যাঁর যত পাণ্ডিত্য আছে, সব ছেড়ে দিলেন। মহামহা যোগীসকল সমাধি-লাভের জন্য যমনিয়মাদি চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। হঠযোগ বা রাজযোগ-প্রণালী—কর্ম বা জ্ঞানযোগ-কথা সব ছেড়ে দিলেন। যাদের যা আস্বাদ্য পদার্থ হয়েছিল, যার যে রস প্রিয় বলে মনে হয়েছিল—যেমন বিষ্ঠার মাছি, সে পূতিগন্ধের দিকে দৌড়বে, সুগন্ধি ফুলের কাছে যাবে না; কতকগুলি লোক রাজসিকী, কতকগুলি তামসিকী, কতকগুলি সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়ে জড়রসভোগে প্রমত্ত হয়ে শান্তিতে বাস করবার জন্য চেষ্টা করছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণ-ভক্তিরস প্রচার করলেন, তখন যার যেটাতে রসবোধ হচ্ছিল, সব রস কেটে গেল। জড়রসভোগী ও ত্যাগীর যথাক্রমে (জড়) রসসাহিত্য ও রসরাহিত্য-বিচার। কিন্তু ভক্তিরস ভোগীরও নয়, ত্যাগীরও নয়। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার, আর ভগবৎসেবা-রসের বিচার এক নহে। অন্বয়ভাবে দেখতে গেলে দুইটিতে সাদৃশ্য দেখে প্রথমমুখে এক মনে হয় বটে, কিন্তু ব্যতিরেকভাবে দেখতে গেলে উহা এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক—আকাশপাতাল

পার্থক্য বিদ্যমান। বিবর্তবাদীর বিচার ও মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার কখনই এক হতে পারে না।

ভক্তিরস কত রকম? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর---এই পঞ্চ মুখ্য রস। জড়রসপ্রিয়---জড়রস-রসিক আমরা জড়-কাব্যরসামোদী হয়ে এ সংসারের ক্ষণভঙ্গুর রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, নিত্যরসাস্বাদনে আমাদের ব্যস্ততা নেই। সেইজন্য আমাদের সংসার। সংসারে এই পাঁচ প্রকার রস আছে; কিন্তু তা' হেয় অনুপাদেয় বা বিকৃতভাবে। বৈকুণ্ঠে আড়াইটি রস গৌরব ভাবে আছে, আর আড়াইটি এদেশে থাকবার জন্য ব্যস্ত। পাঁচ প্রকার রস গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পরিপূর্ণরূপে আছে, সেই পাঁচের অনুগত বহু রস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত। যাঁরা ইহজগৎ হতে বৈকুণ্ঠ দেখতে যাচ্ছেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠে আড়াইটি (শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্ধ) রস দেখে বলছেন---আড়াইটি আমাদের কাজে লাগুক, আর আড়াইটি নারায়ণের সেবায় লাগুক। কিন্তু কৃষ্ণরসরসিক বলেন, সমস্ত রতি কৃষ্ণকে দিতে হবে। আনখকেশাগ্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় উৎসর্গীকৃত করে সর্বপ্রকার রস-দ্বারা সেই রসময় রসিকশেখর কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার বিচার না আসলে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার থেকে যাবে, সুতরাং শুদ্ধভক্তিবিচার হতে তৎপরিমাণে পৃথক থাকতে হবে।

পূর্বেই বলেছি---জড়জগৎ চিজ্জগতের বিপরীত দর্শন। ভোগীর রস ভোগ্য-পদার্থ-সহ সংযুক্ত। সেই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ্যপদার্থে সচ্চিদানন্দরস নেই। আত্মায় কেবল চিন্মাত্র বর্তমান; জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বে চিন্মাত্র। জড়জগতের ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ত্রিপুটি---তিনপ্রকার অমঙ্গলের কথা আছে, তা' হতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সচ্চিদানন্দ আলোচ্য হলে গুণত্রয়ের হাত থেকে মুক্ত হব, নতুবা এই গুণ নিয়ে সেখানে লাগাতে যাব। বিষ্ণু নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ ও নিত্য আনন্দময় বস্তু; আমরা আত্মানাত্মবিবেকহীন হয়ে যেমন 'দেহ-দেহী'তে ভেদ বিচার করি, সচ্চিদানন্দ ভগবানে তাদৃশ ভেদ-বিচার নেই। এই বিচার না হলে ভক্তিরসের উদয় হচ্ছে না, তা না হলে ভগবদুপলব্ধিও সুদূরপরাহত।

যদি বলেন, আপনারা বেদমুখে ভজনীয় পদার্থ-বিচারে বিষ্ণুর দশাবতারের কথা বলছেন, অন্যদেবতার কথা বলছেন না। তাতে শ্রীভগবান্ গীতায়

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" এই গানটি শুনাচ্ছেন। "অনয়ারাধিতঃ" আর "অনয়া মীয়তে"---এই দুইটি বিচার আছে; এই প্রথমটি ভক্তি, দ্বিতীয়টি অভক্তি। একটি মাপ দেওয়ার বিচার, আর একটিতে মেপে নেওয়ার বিচার। মেপে নেওয়া ধর্মে আবদ্ধ যারা, তারাই বদ্ধ। মুক্তপুরুষের কৃষ্ণের কি কথা আছে, আলোচনার নামই মুক্তি; আমাদের কথা দিয়ে কৃষ্ণকে না মেপে কৃষ্ণের কথা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিচারই মুক্তপুরুষের বিচার।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন---"মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্"। মুক্তি হলেই ভক্তি আরম্ভ হবে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন----

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্তঃ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি।।"

হে হরিনাম প্রভো, হে বৈকুণ্ঠনাম, হে মুক্তকুলোপাস্য, আপনাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করি। বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে সমস্ত অঘ দূরীভূত হয়, সূর্য্য প্রবল হলে যেমন আকাশের কুজ্ঝটিকা সমস্তই কেটে যায়, তেমনি মুক্তপুরুষের উচ্চারিত নাম শ্রবণ করে উচ্চারণ করতে করতে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে আলো হয়ে যায়।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।"

'অঘ' অর্থাৎ পাপ, অশেষ পাপ জিনিষটা---সেই বৈকুণ্ঠবস্তু নামটি এসে গেলে কেটে যায়। কিন্তু তাঁকে পেতে গিয়ে আমাদের মলিনতা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে সচ্চিদানন্দ---বাস্তব সত্যবস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্তে অসৎ, অচিৎ, অনিত্যানন্দপ্রধান সত্যাভাসের অনুসন্ধান হয়ে যাবে---রজঃসত্ত্বতমোগুণমধ্যে আপেক্ষিকতা-চালিত হয়ে দুর্গতিই বরণ করব।

ভক্তিকে সাধারণ কর্ম, জ্ঞান ও মিশ্রভাবে বিচার করবার যে দুর্গতি, তা' থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবানই বলছেন----

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এত কথা বলবার দরকার হচ্ছে। একদিকে ভক্তি, অপর দিকে অভক্তির বিচার। কৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যস্থলে ভক্তিরসটি বর্তমান। ভক্ত ভক্তিরসযুক্ত হয়ে

কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। ভজনীয় বিচারে কৃষ্ণই পূর্ণ---সর্বোত্তম, তিনি অখিল-রসামৃতমূর্তি।

আমাদের রস-বিচার হচ্ছিল। 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'---এই প্রয়োজন-শ্লোক-বিচারে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন-বিচার আছে। এতে রস বলে একটি জিনিষ আছে। নির্ভিন্নব্রহ্মজ্ঞানে রস শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বেদ বলছেন---

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

চিন্ময় রসের বিচার না থাকলে জড়রস এসে যাবে। কাল্পনিক রসে রসরাহিত্য। জড়রস শুকিয়ে ফেলতে হবে, এটা ঠিক---যেমন "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ" ইত্যাদি; কিন্তু ভক্তিযোগে যতক্ষণ রস উৎপন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা জড়রসসাহিত্য ও জড়রসরাহিত্য মধ্যেই আছি। কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র জিনিষ। শান্তভাবে নিরপেক্ষ ভাব; তিনি সেবা নিলে সেবা করব, আমার চেষ্টা তাঁর অনুগ্রহ-সাপেক্ষে ফলবতী হবে। দাস্যরসে তিনি সেবা নিলে আমি সেবা করে আনন্দ পাব। সখ্যরস---প্রেয়োরস, এতে আমার ভাল লাগে যাকে, যার আমাকে ভাল লাগে---এই ভাব। বাৎসল্যরসে আমি যাকে স্নেহ করি---যেমন পিতা-মাতার সহিত পুত্রকন্যা। এর পর মধুররতি, তাতে স্ত্রী-পুরুষের যে রস। এইটি সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। তারা মনে করে কৃষ্ণলীলা বুঝি তাদেরই ন্যায় সাংসারিক ব্যভিচারপূর্ণ; সেই সব সর্বপ্রকার হেয়তা বর্জিত হয়ে সর্বাঙ্গ-সুন্দর ---পরমোপাদেয়রূপে কৃষ্ণলীলাকে দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণে সর্বাপেক্ষা ভাল art. Posing-টা not to be considered as indecent. সেই জন্য মহাকবি জয়দেব বলেছেন---

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্।।

জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর, যদি রসময় হরিতে প্রীতি থাকে, তাঁর রসবিচিত্রতা জানবার দরকার থাকে, হরিলীলায় স্পৃহা থাকে, তবে জয়দেব কবির মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলী---অষ্টপদী গীত শ্রবণ কর।

ভগবানের যতগুলি প্রকাশমূর্তি আছেন, তাঁদের কথা আলোচিত হোক। অন্যদেবতার কথা নয়, তাঁরা আলাদা; আর ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র। অন্যদেবতার মুখোস পরালে বাইরে পঞ্চদেবতারূপে অন্যলোকের চাকরী করানোর বিচার হয়। ভগবানের সেবা করা দরকার, তাঁকে দিয়ে চাকরী করানোকে ভক্তি বলে না। বর্তমানে মনুষ্যজাতির দুর্বুদ্ধি হয়েছে, ভগবান্‌কে দিয়ে তাদের সেবা করিয়ে নেবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা বলেছেন---চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্তন কর---কৃষ্ণভজন কর, তা' বিশেষরূপে আলোচনা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না থাকলে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার কি করে হবে? শেষে হয়ত নির্বিশেষ-বিচারই বরণ করে বসবো। চৈতন্যদেব লোকের বুদ্ধিকে শোধন করবার জন্য এই সকল কথা বলেছেন, তা' আমরা ভাগবত আলোচনা না করলে বুঝতে পারবো না। চৈতন্যদেবের কথা প্রতি পদে পদে আলোচনা না করলেই অসুবিধায় পড়তে হবে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান লোক চৈতন্যদেবের কথা বিচার করুন। ---"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার।।"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

ত্রয়োদশ দিবস

(৫-৯-৩৫)

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটি পাই, তাতে একটি কথা পাওয়া যাচ্ছে,—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" যে বস্তুকে সকলে ধ্যান করি, সেই বস্তুটি আদিকবির হৃদয়ে বেদজ্ঞান বিস্তার করেছিলেন। যাঁদের কাব্যে অধিকার আছে, তাঁরা কবি।

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ

তে সর্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবঃ তেভ্যো নমস্কুর্মহে।

বিষ্ণুকে নলিন-নাভ বলে, তাঁর নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি। সেই কবি কাব্যরসে পণ্ডিত ছিলেন। সে শক্তি না থাকলে বেদজ্ঞান বিস্তার হবে কেমন করে? 'ব্রহ্ম'-শব্দে তপস্যা, বেদজ্ঞান, বৃহদ্বস্তু, 'তৎ সৎ' নিত্যবস্তুকে বুঝায়; 'তেনে' শব্দে বিস্তার করেছিলেন। সেই বস্তু (বেদজ্ঞান) মধ্যে মধ্যে বদ্ধজীবহৃদয়ে অপ্রাকট্য লাভ করে।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।"

সেই কথা প্রলয়ে ক্ষণভঙ্গুরাভিমানিগণের নিকট পরিবর্তিত হয়ে যায়, আবার নূতন করে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার প্রতিদিবসে যে প্রলয় হয়, তাতে বেদবাণীগুলি স্মৃতিপথে থাকে না। ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বেদজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে জানা যায়, তিনি কাব্যবিশারদ ছিলেন। এখানে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে

পারে—কাব্য কাকে বলে? ব্রহ্মা কোন ধনে ধনী ছিলেন? তার উত্তর এই যে, রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। বাক্যের সংজ্ঞা—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি —এই সকল সংযুক্ত হয়ে যে পদসমূহ, তাকে বাক্য বলে। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। সেই কাব্য-বিষয়ে ব্রহ্মা রসিক ছিলেন। তাঁর হৃদয়ে রসিকবর ভগবান্ বেদজ্ঞান বিস্তার করেছেন; তাঁকে রসাত্মক কাব্য বলেছিলেন। তাতে ব্রহ্মার যোগ্যতা আছে। 'যোগ্যতা' মানে পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপণে বাধার অভাব। 'আকাঙ্ক্ষা' অর্থে উদ্দিষ্ট ব্যাপার, আর 'আসক্তি'—বুদ্ধির ব্যবচ্ছেদরাহিত্য। পদের সমুচ্চয়ে যে সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাতে ঐ তিনটি লক্ষ্য করা যায়। যোগ্যতা অযোগ্যের সহিত একীভূত হলে কোন অর্থ হয় না, দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাক্য বলতে গিয়ে নামরূপগুণক্রিয়াদি না বললে জ্ঞেয় পদার্থ বলা হয় না। রসযুক্ত বাক্যে তিনটি বিষয় থাকা চাই—আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন। অনেকেই বলেন যে, দর্শনশাস্ত্র নীরস; কিন্তু তা' নয়, এটি বিশেষ কাব্য। যাতে নানাপ্রকার ক্ষণভঙ্গুরতা নিরস্ত হয়েছে, যাতে বিজ্ঞতার অভাব নেই—সর্বজ্ঞতা, অধিষ্ঠানগত পূর্ণতা ও আনন্দময়তা সংশ্লিষ্ট।

অনেকের উপনিষদ্‌পাঠে আংশিকদর্শনে রসরাহিত্যশিক্ষার বিচার হয়। কিন্তু উপনিষদ্ বলেন—"রসো বৈ সঃ।" "সঃ"টি—ক্লীবের পদ নয়, সর্বনাম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু,—যাঁর চেতনতা, আনন্দ ও নিত্য অবস্থান আছে। 'তৎ' পদার্থই 'সঃ'—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। 'সঃ'কে 'সা' বললে অধীন বা বশ্য স্ত্রীবিচার আসে। কিন্তু 'সঃ' পুরুষোত্তম বস্তু, তিনিই রসময়। শক্তিপর ব্যাখ্যার নিষেধার্থে 'রসো বৈ সঃ' ব্যবহৃত হয়েছে। সেই জ্ঞেয়, পূর্ণজ্ঞানের পদার্থই রস। অনেকের বিচার —রসরাহিত্যই জ্ঞান। জড়রসের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য জড়রস-রাহিত্য হওয়া দরকার—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, উহাতে আমাদেরও আপত্তি নেই। কিন্তু সেই বস্তুটি জড় নীরস নয়। তাতে রসটি সার হয়েছে। তাঁর বাক্য বলার ক্ষমতা নেই, তা নয়। তিনি অভিজ্ঞ, স্বরাট্, initiative নিতে পারেন। স্বতঃকর্তৃত্ব করতে পারেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের বাধাপ্রাপ্ত-তাৎকালিক কর্তৃত্ব নয়। Paralysis হলে, মরে গেলে আমাদের কর্তৃত্ব চলে যায়, কিন্তু তিনি নিত্যকাল স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্মবিশিষ্ট, খানিক পরে জীবন বা চেতন রহিত হয়ে যান না। রসাত্মক

বাক্যের নামই কাব্য—কেবল জড়াশ্রয়ে কাব্যের জীবন—এরূপ নহে। আদিকবি ব্রহ্মা সেই চিন্ময় কাব্যবিৎ ছিলেন। তিনি কবি—রসজ্ঞ অর্থাৎ রসিক ছিলেন বলেই ভাগবতের তথ্য পেয়েছিলেন। সেইটি রসাত্মক-বাক্য-বিকাশরূপ শ্রুতি-তাৎপর্য। তা' যাঁরা শ্রবণ করতে পেরেছেন, তাঁরা আনন্দ লাভের অধিকারী হয়েছেন। সেইজন্য "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ" —প্রয়োজনতত্ত্ববিচারে এই কথাটি বলা হয়েছে।

সেই রসটি তিনি—আস্বাদকের আস্বাদন তাঁহা হতে পৃথক নহে। তিনি হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—ত্রিশক্তিধৃক্। তাঁরই একদেশে জগৎ অবস্থিত।

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ।।"

একদেশ হতে রশ্মি নির্গত হয়ে স্থানটি আলো করেছে; তাঁর শক্তি এদেশে—অচিৎ-শক্তি-পরিণত জগতে আলো দান করছে। চেতনরাজ্যে অবস্থিত হয়ে অচেতনরাজ্যে রশ্মি প্রসার করছে। জীবশক্তিতেও চেতনধর্ম, আনন্দধর্ম ও সন্ধিনীর ধর্ম এসে উপস্থিত হচ্ছে। 'আমি মরে যাব'—এ-কথাটি ঠিক হয় না, আমার শরীর থাকবে না। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতের সহিত যে মিশ্রচেতনভাব এটা থাকবে না। জড়বস্তুতে যে অভিজ্ঞান পেয়েছি, শরীরপতনে সেটা থাকবে না, যেমন বৃক্ষ—তার স্থূল আকার ও ধারণা জড় থেকে এসেছে, অচিন্মিশ্রভাব চেতনে প্রবেশ করেছে, দ্রষ্টার দর্শনের মান—gradation অনুসারে বস্তুর জ্ঞান হয়েছে, যেমন পাঁচ বৎসরের শিশুর ও চব্বিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির কাব্য পড়ে যে জ্ঞান, তাদের উভয়ের সাহিত্যবোধ একরকম নয়। আংশিকতা-ধর্ম জ্ঞাপক হলে তৎসঙ্গে সঙ্গে উহা প্রসারিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়, অনেক বিচার আসে, সর্বতোভাবে জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তা' হলে সকলের জ্ঞান সমান নয়। যে যতটা কৃষ্ণানুশীলন করবে, সে ততটা নাম-রূপ-গুণলীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বা পারিপার্শ্বিকতা জানতে পারবে। কৃষ্ণেতর পদার্থ আলোচনা করলে—আমার ভোগ্য, গাধার ভোগ্য, আমার বন্ধুবান্ধবের ভোগ্য-বিচারে অচিন্মিশ্র জ্ঞান আসে। ভোগ্যভাব-সংশ্লিষ্ট যে জ্ঞেয়পদার্থ, তাতে পূজোর দর্শন হয় না, কাব্যের পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না।

কাব্য দুই প্রকার,—চেতনের কাব্য ও অচেতনের কাব্য। অচেতনের কাব্যে যে বাক্য বর্ণিত, তাতে যে রস, সেটা সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী বা পারাবত-দম্পতির রসে আবদ্ধ মাত্র। যারা প্রকৃতি দর্শন করছে, তাদের যেরকম কাব্য, তাতে জড়রসই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেইটুকুকে তারা রস বলে বিচার করে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ বস্তুটি রস, এ বিচার তাদের আসে না। "রসো বৈ সঃ" এই রসকে বেদপাঠরত ব্যক্তি জড়নিরসনার্থ বলছেন—নীরস; নিরাকার, নির্বিকার, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলে বিচার হচ্ছে। "কেন কং বিজানীয়াৎ", "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র পড়ে নির্বিশেষ-বিচারে চিত্ত ধাবিত হলে ক্লীববস্তুর ধারণা হয়। কিন্তু "সঃ" বললে ক্লীব নহে। তিনি নিজে রস; তাঁকে লাভ করলেই আনন্দ পাওয়া যায়। আত্মারামগণও সেই রসে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঽপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরিকে অনাত্মপদার্থবিশেষ-বিচারে আবদ্ধ করলে বিশেষ অমঙ্গল। কিন্তু তাঁতে সব রস আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্তি। আপনারা যে শ্লোকটি পূর্বে শুনেছেন,—

যস্যালীয়ত শল্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ।।

—সেই রসময় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রস অবতার-সকলে প্রদান করেছেন। শ্রীজয়দেবও ঐ কথা বলেছেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।।

সেই রসময় কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ-বিগ্রহেও রসবিন্যাস করেছেন। কিন্তু তাতে কোন হেয়তা, অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা আরোপ করতে হবে না। তাঁরা বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁদের স্বতন্ত্র নিত্যবৈকুণ্ঠ আছে। নৈমিত্তিকলীলার জন্য এখানে এসে অনিত্যশরীর গ্রহণ করেছেন---এরূপ বিচার ঠিক নয়। তাঁর মায়া-দ্বারা রচিত দেহ জ্ঞান করতে হবে না। তা' হলে অবজ্ঞা করা হবে।

অবজানান্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্।।

সেই পরমভাবে যে পরম-রসোদয়, সেই রসটির ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-বিশেষে যে বিকাশ, তাতে আমরা জানি যে, তাঁরা পূর্ণ রসময় মূর্তি শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্তি। যেমন মৎস্যাবতারে দেখতে পাওয়া যায় ---শঙ্কসীন্নি জলধিঃ অলীয়ত। 'শঙ্ক' মানে আঁইস। তাতে জলধি লয় প্রাপ্ত হয়েছে। মৎস্যাবতারে ভগবান্ জুগুপ্সারতি প্রদান করেছেন। সত্যব্রত রাজা কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন। তাঁর হাতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য এসে উপস্থিত হল। তাতে অপবিত্রবোধে জুগুপ্সারতির উদয় হল। 'আমিষস্পর্শ হল' এই বিচারে সেটি ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বিষ্ণু বললেন, আমি ক্ষুদ্র নই, বৃহদ্বস্তু---মূল বস্তু। সুতরাং সত্যব্রত তাঁকে নিজের কমণ্ডলুতে রাখলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর ব্যাপকতা-ধর্ম দেখাবার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হতে থাকলেন। তখন সত্যব্রত তাঁকে রাখতে না পেরে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, ক্রমে বৃহৎসমুদ্রেও কুলায় না। তখন সত্যব্রত রাজা তাঁর প্রভাব দেখে তাঁকে নারায়ণ জেনে স্তব করতে থাকলেন। সত্যব্রতের হিতকামনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁকে বললেন,--- "অদ্যাবধি সপ্তম-দিবসে লোকত্রয় প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্ন হবে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তুমি সমস্ত ঔষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হয়ে ঐ নৌকায় আরোহণ করে প্রলয়সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ করবে। যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হবে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বেঁধে দেবে। আমি ব্রাহ্মী নিশা অবসান পর্যন্ত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করবো।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাকে বিনাশ করে বেদ উদ্ধার করে 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ করেছিলেন। এটি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়েছিল। আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে।

মৎস্যাবতারে জুগুপ্সারতির পরিচয় পাওয়া যায়। জুগুপ্সারতি দুই প্রকার,-- -একটি প্রায়িকী এবং আর একটি বিবেকজা। বদ্ধ জীবাত্মা তামস-ভাবাপন্ন হলে মৎস্যযোনি লাভ করে, যারা তাকে খায়, তারাও তমোগুণবিশিষ্ট। ভার্গবীয় মনু বলেন---

"মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জয়েৎ"

উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, অখাদ্য। যারা মাছ খায়, মাছগুলো আবার পরজন্মে মানুষ হয়ে তাদের খায়। যারা খাবে, তারা তখন মৎস্য হবে। এরূপ আদান প্রদান চলতে থাকে। সত্যব্রতের যে ঘৃণা হয়েছিল, সেটি আঁসের দুর্গন্ধ পেয়ে। কিন্তু মৎস্যদেব পাপজনিত তনুধৃক্ হন নাই, তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে অবতীর্ণ; অধোক্ষজ বস্তুই মৎস্যরূপে এসেছিলেন। তাঁকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বুঝতে পারা যায় না। সুতরাং তিনি ঘৃণার জিনিষ নন। মৎস্যবৈকুণ্ঠে তিনি নিত্য লীলা করছেন, সেখানে সত্যব্রত রাজা আছেন। যারা ভগবদ্‌বস্তুকে অবজ্ঞা করে, মাছ-জাতীয় মাত্র বিচার করে, তাদের নরকে গমন হয়।

অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধি।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।

পাথরে শালগ্রাম-বিচার নরকগমনের হেতু। যে পাথর রাস্তায় পড়ে আছে, মানুষ, গরু, ঘোড়া যার উপর চলে যাচ্ছে, শালগ্রাম সেই রকম বস্তু বিচার করলে। দর্শনে ভ্রান্তি হলে তাঁকে সর্বতোভাবে সেবা করতে হবে। চেতন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হলে আমরা পাথর হই। কিন্তু ভগবান্ পাথর নন। পাথরে জীবনীশক্তি নেই। তাঁর চেয়ে কিছু চেতনের বিকাশ বৃক্ষে, তদপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানব এবং তদপেক্ষা দেবতায় চেতনের বিকাশ অধিক। Phytomorphic

growth হলে জীবনী শক্তি আছে জানতে পারা যায়। দেবতা হতে মানব, পশু, বৃক্ষ ও পাথরে চেতন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়েছে। দেবতারা জানেন, তাঁদের উপাস্য বিষ্ণু, কিন্তু সকল মনুষ্য সকল সময় এই সত্য জানেন না। কতকগুলি নাস্তিক, কতক ব্যক্তি অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) আবার কতক লোক সন্দেহবাদী (Sceptic), নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাদের বিচার—জড় থেকে চেতনধর্মের উৎপত্তি। কিন্তু চিন্মাত্রবাদ চেতনকেই মূল বস্তু বলে স্বীকার করেন—'Tabula rasa' পূর্ণবস্তু অচিতের দ্বারা আবৃত হয় মাত্র। বিষম আবরণের সঙ্গোপনে নিত্যের নির্বিশিষ্ট বিচার। সমজাতীয়ের সংযোগে চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য প্রকাশ।

মৎস্যদেব জুগুপ্সারতির বিষয়। জুগুপ্সারতিতে সামগ্রী সম্মেলনে বীভৎস রসের উদয় হয়েছে। রস দ্বাদশপ্রকার,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটি মুখ্য। সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি, প্রেমভক্তিতে রস—তিনটি শব্দ পর পর আছে। সাধনের ক্রমপন্থায় এইগুলি জানতে পারা যায়। প্রেমভক্তিপর্যায়ে ভক্তিরস। "শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম শ্লোকে এই অখিলরসামৃতমূর্তির কথা দেখতে পাই—

অখিলরসামৃতমূর্তিঃ প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি।।

ভক্তিরস ভাগবতের অভিধেয়-বিচার। ভাগবত পড়া হলে আর অভক্ত থাকবে না, জড়রস থাকবে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হবে। পাঁচ প্রকার রসের নমুনা জগতে কিছু পাওয়া যায়। কীর্তনের দ্বারা জড়রসসঙ্গ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কীর্তন না শুনে কীর্তন করলে অসুবিধা। জড়ভোগপর প্রাকৃত সহজিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-রসভেদ বুঝতে পারে না। অপ্রাকৃত রসে শত-সহস্র—অখিল সদ্‌গুণ আছে। তাতে জড়ের বিগুণভাব আরোপ করতে হবে না। এটি প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝতে না পেরে জড়রসে অভ্যাসবিশিষ্ট হয়ে যায়। তজ্জন্য শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ-কর্তৃক 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী' ঢাকায় প্রচারকালে দ্বিতীয়বার

প্রকাশিত হয়েছে। ফল্গু-বৈরাগী হয়ে গেলে গোষ্ঠানন্দী না হয়ে জড়রসে বিবিক্তানন্দী হবার বিচার হলে অসুবিধা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের কথা তাদের কানে ঢোকে না। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবত রস পান কর ভাবুক রসিকের সঙ্গে। তা' না করলেই অসুবিধা।

আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ভাগবতরস পান করেছিলেন। ভাড়াটিয়া পাঠকদিগের নিকট জড়রস অধ্যয়ন বাদ দিয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, তাদের মুখে ভাগবত-পাঠ শুনতে নেই। তাদের অন্তর্নিহিত ভোগই ভাগবত পড়তে দেয় না। বেশ্যার মুখে গান শুনতে নেই—তাতে দোষযুক্ত বীজাণুর সংক্রামকতা প্রবেশ করে।

শত বৎসর পূর্বের কথা বলছি, তখন বৃন্দাবনে অনেক ত্যক্তগৃহ উদাসীন বৈষ্ণব ছিলেন। * * * শিরোমণি পাঠক উদর-ভরণের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বৈষ্ণবদের নিকট ভাগবত পাঠ করতে পারলে তাঁদের নিকট পয়সা না পাওয়া গেলেও অন্যের কাছে আদায় করতে পারা যাবে। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাগবত শুনতে স্বীকৃত হলেন না। ভাগবত পাঠ করে জীবিকা অর্জন—শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙ্গার ন্যায় বিচার। প্রয়োজন—নিজেন্দ্রিয়তোষণ; কিন্তু ভাগবত পাঠ করলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-বিচার আসে। আপনারা জানেন—পাঁচের অল্প সঙ্গ হতে ভক্তি জন্মে, তার মধ্যে ভাগবত-পাঠ একটি। রসিকের সঙ্গে পাঠ শুনতে হবে, জড়রসরসিকের সঙ্গে নয়, অপ্রাকৃত-রসরসিকের নিকট। জড়রসে প্রমত্ত হলে প্রলম্বাসুর হতে হবে, তাকে বলদেব মুষ্ট্যাঘাতে বিনাশ করবেন, কপটতা ধ্বংস করে দিবেন।

রসবিচারটি জড়রস নয়। কাব্যপ্রকাশ বা সাহিত্য-দর্পণ পড়ে রসজ্ঞান হবে না। ভরতমুনি-রচিত নাট্যশাস্ত্রে কাজ চলবে না। আদিকবির রস স্বতন্ত্র। সেটা উদিত না হলে "অর্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" বিচার আসে।

গুরুদেবে মনুষ্য জ্ঞান হলে নরকে গমন করতে হবে। গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি এই যে, আমি তাঁর থেকে বুদ্ধিমান অথবা আমা অপেক্ষা তিনি কিছু অধিক বুদ্ধিমান, তাঁর বুদ্ধি বাড়িয়ে দেব, তাঁর আর্থিক উন্নতি করে দেব ইত্যাদি। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করতে হবে না। এই বৈষ্ণবটি জার্মান দেশের, এটি ভারতবর্ষের,

ইনি বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নন ইত্যাদি বিচার হলে সর্বনাশ। তা' হলে অহংমমভাব-নামাপরাধ প্রবল হয়ে বৈষ্ণবতা হতে বিচ্যুতি ঘটাবে। যদি কেউ বলেন, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদে অধিকার নেই, ওদের হরিভক্তি হবে না, (মাধ্ব তত্ত্ববাদিশাখার যে প্রকার মত, তারা বেশী conservative) কিন্তু তাতে মহাপ্রভু বলেন---মধ্বের মতে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা নেই, "কৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,---তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং। স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।। গীতায়ও বলেছেন---

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।।"

শ্রীরামানুজ আচার্য্য শ্রীশঠকোপদাস প্রভৃতি আলোয়ারত্রয়কে নিজগুরুপাদ-পদ্মের অভিন্নতত্ত্ব বলে জানেন। তাঁরা লৌকিক বিচারে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবরকুলে উদ্ভূত শঠকোপ দাস দ্রাবিড় আম্নায়ের রচয়িতা। তাঁকে আলবন্দারু মুনি স্তোত্ররত্নে বিভিন্নরসের উপাদান বলে বর্ণন করেছেন---

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না।।

শ্রীসম্প্রদায়ে আলোয়ারগণকে 'দিব্যসূরি' বলে থাকেন। কাষারমুনি, ভূতযোগী, ভ্রান্তযোগী, ভক্তিসার, শঠারি বা শঠকোপ, কুলশেখর, বিষ্ণুচিত্ত, ভক্ত্যাঙ্ঘ্রিরেণু, মুনিবাহ, চতুষ্কবি---এই দশজন সর্ববাদিসম্মত দিব্যসূরি। কেউ কেউ গোদাদেবী ও রামানুজ---এই দুইজনকে ধরে দ্বাদশ জন আল্‌বর বা দিব্যসূরি বিচার করে থাকেন। এঁরা সকলে ভক্তাবতার। বৈকুণ্ঠ হতে আগত হয়েছেন।

স্বাধ্যায়নিরত নন বলে, বেদে অধিকার নেই বলে গুরু স্বীকার করা যাবে না, তা' নয়। গুরু সর্বপূজ্য। গুরুর অপর নাম বৈষ্ণব। তাঁর নিকট লঘু হতে হবে।

"আমি ত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী।।"

----এই বিচার বুঝতে পারলে গলায় মালা, নাকে তিলক দেওয়াকে বৈষ্ণবতা-অভিমানকারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সঙ্গে গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যাবে। তাদের ক্রিয়াকলাপ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ, তদ্দ্বারা নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে জলবুদ্ধি করতে হবে না। বিষ্ণুর চরণামৃত মহাদেব শিরে ধারণ করেছেন। চিন্ময়ী গঙ্গাকে সাধারণ বারি মনে না করে সম্মান করলে বিষ্ণুভক্তি হবে। বৈষ্ণবের পাদোদকও তদ্রূপ।

বিষ্ণুনামে বা মন্ত্রে শব্দবিশেষ বিচার করলে অমঙ্গল। 'বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘ-হরং বিদুঃ'---বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে অশেষ পাপ ধ্বংস হয়, মায়িকনাম-গ্রহণে হবে না।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।"

----বিচার না থাকলে মায়িক নাম হবে। তদ্দ্বারা তুচ্ছ-ফলপ্রদ ধর্মার্থকাম-প্রাপ্তি অথবা তার অপ্রাপ্তি ঘটবে। "বিষ্ণুমন্ত্র ব্যাকরণ নিষ্পন্ন শব্দবিশেষ, তাতে স্বাহা, স্বধা, নমঃ সংযোগে চতুর্থ্যন্ত পদের প্রয়োগ হয়েছে; আর নাম সম্বোধনের পদ---হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বলে চেঁচাচ্ছে, তাতে কি সুবিধা হবে? পিত্তবৃদ্ধি হবে মাত্র",----একথা যারা বলে, তাদের নরকগমন অনিবার্য। বিষয় না বুঝে নাম নিলে নামের তুচ্ছফল প্রাপ্তি হয়। ওলাউঠা, বেরিবেরি ভাল করা, মোকদ্দমাজয়, ছেলের স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির জন্য যে চিত্তবৃত্তি, তাতে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ হয় না। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে সকল অঘ যাবে---সকল পাপ বিনষ্ট হবে। বিষ্ণু সব দেবতার উপাস্য। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-গাছ-পাথর কারও কোন কাজ নেই বিষ্ণুসেবা ছাড়া। মৎস্যাবতারের সেবা করতে হবে। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। ভগবান্

ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ থেকে যে ছয়প্রকার বিচার আসছে, তা' হতে শাস্ত্র সাবধান করে দিয়েছেন। ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণকে বিষ্ণুর সঙ্গে সমান জ্ঞান করাও তাদের অন্যতম। বিষ্ণুরই আরাধনা কর্তব্য। রসজ্ঞগণ এটা বুঝতে পারেন। মৎস্যদেব জুগুপ্সারতিতে আবির্ভূত হলেও তাঁতে অনুপাদেয়তা বা তামসধর্ম নেই। তাঁকে হীন বিচার করে তজ্জাতীয় সেবকসম্প্রদায়কে ঘৃণা করলে বিষ্ণুকে আক্রমণ করা হল। চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি কৃষ্ণে নেই, কেবল কৃষ্ণেতর পদার্থেই জুগুপ্সারতি নিযুক্ত—এই প্রকার বিচার নিরাস করে বুদ্ধি শোধন করবার জন্য মৎস্যাবতারে বীভৎসরস। তিনি হয়গ্রীবকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন।

বেদ পড়ে অপরা বিদ্যার অনুশীলন করলে ভগবদ্-বস্তুর জ্ঞান হয় না। আপনারা মুণ্ডকোপনিষদে ''দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চেতি'' পড়েছেন; বেদাঙ্গষটক ও বেদচতুষ্টয় ভোগবুদ্ধিতে পড়লে অপরা বিদ্যা হবে, তা' প্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ''পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে''—যদ্দ্বারা ভগবানের অনুশীলন হবে। অপরা—যা' সাধারণ ভোগী সম্প্রদায়ের স্কুল-কলেজে শিক্ষা হচ্ছে, তা' মনুষ্যের ভোগে, নিজেন্দ্রিয়তর্পণে লাগবে। ঐগুলি কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগলেই মঙ্গল।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।

''প্রেম পুমর্থো মহান্''—শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা অনুধাবন করলে যথার্থ ভাগবতার্থবোধ বা মঙ্গল লাভ হবে।

চতুর্দশ-দিবস

(৭-৯-৩৫)

''ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।''

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবধর্মের উপদেষ্টা। ইহাতে বাস্তব বস্তু বেদ্য এবং কৈতব-রহিত নির্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম কথিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা-দ্বারা কৈতবরহিত ধর্ম লাভ করা সম্ভব নয়। সংসারে ত্রিতাপের হস্ত থেকে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের শ্রীমদ্ ভাগবতের আরাধনা ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু। ভাগবতের অধ্যয়নকারী, শ্রবণকারী, কীর্তনকারী এবং বিচারণপরব্যক্তিই অর্থাৎ স্মরণকারী-ব্যক্তিই সদ্য সদ্য ভগবদ্‌বস্তুকে লাভ করেন। সেই ভগবদ্‌বস্তুর প্রকাশমূর্তিদের কথাও ভাগবতে বর্ণিত আছে।

ভগবান্ অখিলরসামৃত-মূর্তি আর তাঁর অবতারসকল বিভিন্নরসের প্রকাশ-মূর্তি। সেই পূর্ণ-মূর্তি—যাঁ হতে যাবতীয় প্রকাশসকল নির্মল জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হন, সেই অখিলরসামৃতমূর্তি বাস্তব বেদ্য-বস্তুর কথা সর্বতোভাবে আলোচনা হওয়া উচিত।

আমরা পূর্বদিবস মৎস্যাবতারের কথা আলোচনা করেছি। তিনি চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি হতে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয় স্বরূপ, আর কূর্মদেব বিস্ময়রতি হতে জাত অদ্ভুতরসের আশ্রয়। আপনারা জানেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।

সাধনভক্তির ক্রমবর্ণনে 'শ্রদ্ধা' শব্দের উল্লেখ পাই। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।" ইতর ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করলে ভগবৎপদার্থে ঔদাসীন্য হয়। আর বাস্তব-বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা হলে যে-সকল তাৎকালিক বস্তুর প্রতীতি আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করে আছে, সেগুলি অপসারিত হয়।

কূর্মের কথা আপনারা বোধ হয় জানেন। এক সময় দুর্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মান করে একটি মালা প্রদান করেন, তিনি সেটি ঐরাবতের কুম্ভে স্থাপন করেন। ঐরাবত মদমত্ততা-হেতু সেই মালাটি নিয়ে পদদলিত করে ফেলে। তা' দেখে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিসম্পাত প্রদান করে বলেন---"তোমার স্বারাজ্যলক্ষ্মী বিদূরিত হোক"। তখন দেবগণ শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পরমেষ্ঠীর নিকট সকল বৃত্তান্ত জানালেন। ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করে সমাহিতচিত্তে বিবিধ বৈদিক বাক্য-দ্বারা ভগবানের স্তব করতে থাকলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমক্ষে আবির্ভূত হলেন এবং দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন করে মন্দর-পর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করে ক্ষীর-সাগর মন্থন করবার উপদেশ দিলেন। দেবগণ ভগবানের উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে দেব-দানব মিলিত হয়ে মন্দরপর্বত নিয়ে সমুদ্রের দিকে চললেন। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভার-বশতঃ পর্বত বহন করতে না পেরে পথিমধ্যেই সেটি পরিত্যাগ করলেন। তাতে অনেক দেবদানবের প্রাণ বিনষ্ট হল। তখন পরম করুণ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেখানে আবির্ভূত হয়ে কৃপাদৃষ্টি-দ্বারা মৃতব্যক্তিগণকে পুনর্জীবিত করে একহাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মন্দরপর্বত তুলে নিয়ে সমুদ্রে স্থাপন করলেন। তখন বাসুকীকে মন্থনরজ্জু করে মন্দরপর্বতের চতুর্দিক বেষ্টন করা হল। শ্রীহরির কৌশলে মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকীর অগ্রভাগ এবং দেবগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করলেন। মহা উদ্যমে মন্থনকার্য আরম্ভ হল; কিন্তু পর্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিম্নগামী হয়ে সলিল-মগ্ন হয়ে গেল। তখন কূর্মদেব নিজপৃষ্ঠে মন্দরকে স্থাপন করলেন। পুনরায় মন্থন চলতে থাকলে প্রথমে হলাহল বিষ উঠলো। তখন সকলে মিলে সদাশিবের শরণাপন্ন হলেন। আশুতোষ লোকপাবনার্থ সেই হলাহল পান করে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করলেন। তাঁর কথায় আছে---

"নৈতৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।"

বিষটি তিনি গ্রহণ করলেন, তাতে তাঁর কোন অসুবিধা বা কোন অমঙ্গল হয় নি। বিষপান যেমন নীলকণ্ঠেই সম্ভব---অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা---কৃষ্ণচরিত্র যদি অসমর্থ অবিবেচক-সম্প্রদায় আলোচনা করেন, তবে তাঁদের অসুবিধা হবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐরকম ভোগবুদ্ধি করলে সর্বনাশের মধ্যে পতিত হবেন। অরুদ্র হলে---হরিভক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জন না করে ভক্তি পেয়েছি বিচার করলে দুর্দৈব জানতে হবে। অনেকে বিচার করেন, মহাদেব যখন ভবানীভর্তা, তখন তিনি ভোগী---যেরূপ বিচার চিত্রকেতু করেছিলেন। মহাদেবের ক্রোড়ে দেবীকে বসে থাকতে দেখে চিত্রকেতু উপহাস করেছিলেন। তাঁর বিচারে ভুল হওয়াতে অপরাধ হয়েছিল। মহাদেব ভোগী নন। কিন্তু যাঁরা অরুদ্র---ঈশ্বর নন, তাঁরা রুদ্রের অনুবর্তন করলে অসুবিধা হবে। মহাদেবের ন্যায় সংযত না হলে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ মনে করবে। মন যদি সেবা করার বদলে সেবা গ্রহণ করে বসে, তা' হলে সর্বনাশ। এজন্য বলেছেন যে, মনের দ্বারাও কদাপি ওরূপ কথায় প্রবিষ্ট হবে না। কেন না, অরুদ্রের মন দুর্বল---সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। এজন্য রাধাগোবিন্দের কথা ভাগবতে আবরণ করে রেখেছেন। রাধিকার নাম বা গোপীর নাম বর্ণন করেন নি, কেবল ক্রিয়াকলাপ বলেছেন মাত্র---ভোগিসম্প্রদায়ের ওটা জানা হলে, তারা অসুবিধায় পড়বে এই জন্য।

মহাদেব যে বিষ পান করেছিলেন, সেটা এত তীব্র যে, তাঁর পানকালে হাত থেকে কিঞ্চিৎ বিষ পড়ে গিয়েছিল, সেটাই গ্রহণ করে বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি এত তীব্র বিষধর হয়েছে। তারপর সমুদ্র থেকে কতকগুলি বস্তু উঠলো। সুরভি-গাভী উঠলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ করলেন। তারপর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠলে ভগবানের শিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা বলিকে প্রদান করলেন। ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্‌গজ, অভ্রমু প্রভৃতি অষ্টদিগ্‌হস্তিনী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত, অপ্সরাসকল এবং রমাদেবী আবির্ভূত হলেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা উঠলে অসুরেরা

উহা গ্রহণ করলো। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতিকে ইন্দ্র গ্রহণ করলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরী অমৃতকলস হাতে নিয়ে উঠলেন। দেব-দানব-মধ্যে অমৃত নিয়ে কলহ উপস্থিত হলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করে অসুরগণকে বঞ্চনা করে দেবগণকে অমৃত বণ্টন করে দিলেন। তাতে বিস্ময় রতি। অদ্ভুত-রসোদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তি বিস্ময়রতির কারণ। কেবল রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অমৃত পান করছিল। ভগবান্ উহা জানতে পেরে চক্রদ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদন করলেন। কিন্তু অমৃত-পানহেতু তার মস্তক অমরত্ব-প্রাপ্ত হল। শরীর মস্তক থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে গেল। কোন কোন পুরাণের মতে, ঐ শরীরটি 'কেতু' হল।

ভাগবতের শেষাংশে কূর্মদেবের একটি প্রণাম-মন্ত্র আছে—

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।

[পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাস-বায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্তমান রয়েছে, কখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না।]

সেই কূর্মদেব যে নিঃশ্বাস ফেলেন, তাতে সমুদ্রের রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরে যায়। কূর্মদেবের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমুদ্রের আগমাপায়ী স্রোত অদ্যাপি স্তব্ধ হয় নি। তাতে সমুদ্রস্থ রত্নসকল তীরস্থ হয় আবার ফিরে যায়। এই রত্নসকল ভোগ করবার বাসনা হলে অমঙ্গল। নারায়ণ-ভোগ্য বিষয় জীব-ভোগ্য হলে অসুবিধা। জগতে আমরা জাগতিক ব্যাপারকে 'অধন' বলে বুঝতে না পেরে ধন জ্ঞান করে তাতে আবদ্ধ হয়ে যাই। লক্ষ্মীর নিকট বর প্রার্থনা করি জাগতিক সৌভাগ্যান্বিত হবার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যের জন্য যত্ন করি না। কূর্মদেবের শ্বাস-প্রশ্বাস নিত্যকাল আমাদের মঙ্গল বিধান করছেন। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের

অভাব কোন জিনিষটা, কার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ পেতে পারি, এসকল বিষয় বুঝবার চেষ্টা করি না। আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হই। জাগতিক দ্রব্যগুলিরও অস্তিত্ব থাকে না; সুতরাং ঐগুলি প্রয়োজনীয় নয়—না বুঝলে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদনুগ্রহ কেবল জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, জীবের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তা' হলে জাগতিক ভোগ নিয়ে ব্যস্ত থেকে সেবা-বিমুখ হয়ে যায়। ভগবদ্‌বোধবিচার উপস্থিত হলে কেবলমাত্র স্বর্গসুখ-ভোগ বা পার্থিব সুখাপ্তিতে আবদ্ধ থাকি না। যাতে ভগবানের সুখবিধান হয়, সেইরূপ কার্য করার চেষ্টা হয়। আমাদের কিছু লাভ হয়ে সেবা-বিমুখ হলে নিত্য দুর্ভাগ্যের কথা। বিষ্ণু কামদেব, তাঁরই সব। তাঁর কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটি পত্নী গ্রহণ করে-ছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবাবিমুখতা হতে লক্ষ্মীহরণ-পিপাসা আসে। কূর্মের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না করলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করে সেবা-বিমুখ হয়ে যাই। সেটি অমঙ্গলের কথা।

এই কূর্মদেবের লীলায় অদ্ভুত রসের পরিচয় পাওয়া যায়। কূর্মদেব দেবতাদিগের ভোগের ইন্ধন জোগাচ্ছেন; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী দেব-পূজ্যা, তাও সঙ্গে সঙ্গে দেখালেন। তিনি সাহায্য না করলে সমুদ্র থেকে জিনিষ পাওয়া যেত না। "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" বিচারে যখন মন্দর নেমে যাচ্ছিল, তখন তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশ দিয়ে উহাকে রক্ষা করলেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত কঠিন।

"অস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য
নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃঋগ্বেদঃ।"

কূর্মদেবের নিঃশ্বাস হতে বেদ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধ্যক্ষিতকা-দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হলে কূর্মদেব তা থেকে রক্ষা করেন। কূর্মদেবের বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন। অসুরগণ বুঝতে পারে না। তারা ভোগরত। দেবতারা যা ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করে। লক্ষ্মীকে তাঁরা নারায়ণ ভোগ্যজ্ঞানে নারায়ণকেই দান করেছিলেন।

বরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হতে উদ্ভূত। তিনি ভয় রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশ-মূর্তি। স্বায়ম্ভুব মনু নিজভার্যা শতরূপার সঙ্গে জন্ম গ্রহণ করে জন্মদাতা ব্রহ্মাকে

নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদনের আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রলয়জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটি বরাহমূর্তি প্রকাশিত হয়ে ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে গর্জন করতে করতে জলমধ্যে প্রবেশ করে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হতে উদ্ধার করলেন। ইনি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেছেন। 'হিরণ্য'-মানে সুবর্ণ; যারা সর্বদা ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত---**lucre hunter**, তারা হিরণ্যাক্ষ। আর 'হিরণ্যকশিপু' কনক-কামিনী দুটিই সংগ্রহে ব্যস্ত। তাকে বধ করবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্তি। যাঁরা ভগবদ্ভজনে প্রয়াসবিশিষ্ট, তাঁদের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্মসকল নৃসিংহদেব বিনাশ করে দেন। গণদেব সাংসারিক অসুবিধা বিনাশ করেন। তিনি জগতের বিঘ্ন বিনাস করে মানুষকে সেবা বিমুখ করে দেন। গণদেবতার নিকট থেকে তাদের প্রাপ্তি অতি সামান্য। ইন্দ্রিয়জসুখ---কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশামাত্র লাভ। কিন্তু নৃসিংহদেবের বাৎসল্য এরূপ নয়। তাঁর স্নেহ এঁর থেকে ঢের বেশী। জাগতিক সুখান্বেষী ব্যক্তি যেটুকু নিয়ে ঘোরে, গণেশ তার সাহায্য করে, তাকে ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ করেন। চিত্তটা একটা কার্যে থাকলে অন্যত্র যায় না। অন্ধকারে থাকলে আলোক-বঞ্চিত হয় আর আলোকে থাকলে অন্ধকার আসতে পারে না। ভগবৎসেবা-বিমুখ থাকলে ধর্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা প্রবল থাকে আর ভগবৎসেবা-বিশিষ্ট হলে ওগুলি আসতে পারে না। আধ্যক্ষিক বিচারে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু নৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তিনি প্রহ্লাদের যাবতীয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ করে সর্বদা রক্ষা করে থাকেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবজগতে গুরুর কার্য করেন।

আলম্বন-বিচারে বিষয় ও আশ্রয়---দুটি কথা আছে। সেবক প্রহ্লাদ---আশ্রয়, আর নৃসিংহদেব---বিষয়। মাদ্রাজে পার্থসারথীর মন্দিরে পার্থসারথীর আশ্রয় গরুড়কে, রামচন্দ্রের আশ্রয় মারুতিকে এবং নৃসিংহদেবের আশ্রয় প্রহ্লাদকে অনেকটা দূরে স্থাপন করেছে। তথায় বিষয়-আশ্রয়ে অনেক ব্যবধান আছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-আশ্রয়-বিবেক দশমে পাই। ভগবান্ বিষয় ও ভক্ত

আশ্রয়। তাঁরা সমান আশ্রয়যুক্ত। যেমন বার্ষভানবী কৃষ্ণের সঙ্গে একসিংহাসনে অবস্থান করছেন, কিন্তু গৌরববিচারে বিষয়ের স্থান পরমোচ্চ। অন্যত্র বিষযাশ্রয় সম্ভ্রমজন্য দূরে (**respectable distance** এ) অবস্থিত। মাদ্রাজে লক্ষ্য করেছি---কৃষ্ণ অর্জুনের সারথী, কিন্তু এটা ঐশ্বর্যপ্রধান বিচারে লোক-ভ্রান্তির জন্য। বাহিরে আশ্রয়জাতীয় বিচার, প্রকৃতপ্রস্তাবে উপদেষ্টা কৃষ্ণ---বিষয় আর উপদিষ্ট অর্জুন---আশ্রিত; দারুক কৃষ্ণের সারথী। অহঙ্কার প্রণোদিত ব্যক্তিরা বিষয় না বুঝে ভক্তি-গ্রহণের বদলে জাগতিক অমঙ্গল বরণ করে থাকে, ভগবৎসেবায় রসবিপর্যয় ঘটায় বিশুদ্ধ সখ্যবিচার বা বাৎসল্য-মধুরবিচার এবং গৌরবচিারে অনেক পার্থক্য আছে। নৃসিংহ দেবের যে বাৎসল্যবিচারে, তাতে ঐশ্বর্যপ্রাধান্য থাকলেও বৎসলরসের প্রকাশমূর্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে এনেছিলেন। প্রহ্লাদের নির্ভরশীল সেবায় স্বীয় সেবনযোগ্যতার অভাব নেই। তা হলেও এটি গৌরববিচারযুক্ত। কিন্তু শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন করে তাল পেড়ে থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার করতে গিয়ে সেবার বৈক্লব্য-সাধন কর্তব্য নয়। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রমবিচারে সেবাকে নূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর আর সখ্য মুখ্য। এই গুলিতে বিপ্রলম্ভের বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্যে গৌরবভাব মিশ্রিত। সেবক যদি বেশী স্বতন্ত্রতা (**latitude**) না পান তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সব রকম সেবার যোগ্যতা হয় না।

নৃসিংহদেবে বৎসলরতিতে বাৎসল্যরস; প্রহ্লাদের বাৎসল্যরসে নৃসিংহাবির্ভাব; উহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম-বরাহের রস গৌণ। কিন্তু গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ভুজষট্ক গ্রহণ করেছিলেন। গৌররাম, গৌরকৃষ্ণ ও গৌরনৃসিংহ হয়েছিলেন। অন্যপ্রকারবিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষট্ক প্রকাশ। দুবার দেখিয়েছেন। এর বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস।

শ্রীবলদেবের হাস্যরতিতে হাস্যরস। বামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। অবশ্য তার গল্প আপনারা জানেন। বামনদেব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি জগতের সহিত বন্ধুত্ব করবার জন্য এসেছিলেন। এক সখা

অপর সখার কিছু উপকার করেন। কিন্তু বামনদেব স্বয়ং সখ্য স্থাপনে আসছেন। এটা বলি আগে বুঝতে পারেন নি। তিনি দান করতে বসেছেন; কিন্তু তাঁর মন্ত্রী শুক্রাচার্য, যিনি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন, যাঁর নাম কবি, তিনি দান করতে নিষেধ করলেন—

"সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্"

বলির দানের অভিমান ছিল। উহা তপস্যা প্রধানবিচার। আমার জিনিষ অন্যের কাজে দিব, ইহা altruistic idea. যে দান চাইবে, তাকে দেওয়া যাবে, তাতে অসম্পূর্ণতা আছে; কিন্তু ভগবানের দয়া—পরিপূর্ণ বস্তু।

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্বলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরান্ত চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে।।

বলিরাজা সাধারণ লোকের ন্যায় বিচারসম্পন্ন, আর পরামর্শদাতা শুক্রাচার্য বিষ্ণুভক্তির জন্যই যত্ন করে থাকেন। তিনি বলছেন—

ত্রিবিক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্তিষ্যসে কথম্।।

তিনি বলিকে বলছেন, ভগবানকে তুমি ছোট মনে করছ; তিনি ভিক্ষুক-সজ্জায় এসেছেন বলে তাঁকে বুঝতে পারছ না। কিন্তু দ্যাবা পৃথিবী—তোমার যা সম্পত্তি আছে, তাতে কুলোবে না, সব চলে গেলে বেকার হবে। যখন পা বিস্তার করবেন, তখন দুই পায়ে সব গ্রহণ করে নেবেন, তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারবে না। তোমার সব গেলে থাকবে কোথায় অর্থাৎ বলির সব গেলে শুক্রাচার্যকেও বেকার হতে হবে। এ জন্য বলছেন—দান করে কাজ নেই, তোমার ভাণ্ডে এত জিনিষ নেই। বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি, এখানে মাত্র একপাদ। চারপোয়াতে পূর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশে আনতে পারা যায় না। জগতকে ত্রিপাদবিভূতি দেওয়া হচ্ছে না, তাদের বামন-দর্শন-ক্ষমতা হয় নি। আমাদের দৃষ্টি একপাদযুক্ত। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশ থেকে জানতে পারা যায় না।

বামনদেব—সখ্যরসযুক্ত। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গ মর্ত্য দেখিয়ে উপকার করছেন না, বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে যাবেন। সেখানকার যা কৃত্য, তাও করাবেন। অনাত্ম-প্রতীতিতে স্বর্গ ও মর্ত্য এই দুটি মাত্র বিচার। আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত ব্যতীত জগতের লোক আর কিছু বোঝে না। তদ্দ্বারা কেউ অজ্ঞ, কেউ নাস্তিক, কেউ সন্দেহবাদী, কেউ বা অপরোক্ষানুভূতিতে যত্নবিশিষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সেবা করতে হয়, সেবকের আত্মদান করতে হয়। সেটি আর একটি পা দিয়ে ভগবান গ্রহণ করেন—

"ত্রেধা নিদধে পদ্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে"

এখানে একটি স্থূলশরীর আর একটি সূক্ষ্মশরীর, এ দুটির যে ব্যোম, তা অতিক্রম করে তৃতীয় ব্যোম পরব্যোম—চেতনের ব্যোম। সেখানে সব চেতনপদার্থ, উপাধিমাত্র নয়। সূক্ষ্মশরীর (Astral body) যে ব্যোমে থাকে, সেটা চিদাভাসাকাশ। ভূতাকাশ ও সূক্ষ্মাকাশ হতে পরব্যোম স্বতন্ত্র। সেখানে আত্মপ্রতীতি, অনাত্মবিচার সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহজগতের ভোগ ও ত্যাগ—স্থূল সূক্ষ্ম-বিচার নিয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। তা 'সদসদ্ভ্যাং পরম্।"

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।

'সৎ' শব্দে স্থূল অস্তিত্ব, 'অসৎ' শব্দে সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। স্থূল-সূক্ষ্মভাবরহিত আত্মজগৎ। সেখানে জাগতিক বস্তু নেই।

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

'আত্মবিৎ' এর অবস্থিতিক্ষেত্র স্থূল বা সূক্ষ্ম আকাশ নয়, এটা ছাড়িয়ে অধোক্ষজপদার্থে অবস্থান। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, অসতো সতোঽজায়ত" —এটা ঔপাধিক বিচার। তাঁ হতে সৎ ও অসৎ এসেছে।

বলি দুই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—পার্থিব ও আমুষ্মিক সম্পত্তি, যাতে ভোগময়ী চিন্তা প্রবল সব দিয়ে দিলেন। তখন ভগবান্ তৃতীয় পদ দেখালেন। সেখানে উপাধি নেই। নিরুপাধিক হয়ে হরিসেবা কর। কামদেব সেবা নিতে বক্ষে তৃতীয়পদ দিলেন। অনাত্মবস্তুতে যে অধিকার, যাতে ষষ্ঠী ও প্রথমার প্রয়োগ —সব নিলেন। তিনি কিরূপ সখা? প্রপঞ্চবন্ধু বা স্বজনাখ্য দস্যু নন। ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য পার্থিবমিত্রতার বিচার। তার থেকে পরিণামে বঞ্চিত হতে হয়। ভগবান্ দুটি পা দিয়ে ঐগুলি চাপা দিয়ে তৃতীয় অবস্থার নিজত্ব—আত্মা পর্যন্ত নিয়ে পদসেবায় নিযুক্ত করলেন। এখানে সখ্যরসের সুনির্মলতা। এ রকম সখ্যর ভাব অন্য জায়গায় নেই, এখানেও মুখ্য রসাশ্রয়।

পরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্তি। দশটি অবতারের মধ্যে সাতটিতে গৌণরস আর তিনটী অবতারের মুখ্যরস। নৃসিংহদেব বৎসল, বামনদেব সখ্য আর বুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধের শান্তরস জড়ে ভোগ বুদ্ধিরহিত হয়ে যাওয়া। এটিও মুখ্যরসের অন্তর্গত, তবে রসের মূর্তি নেই। নিজের চেষ্টায় সেবা না করে অজ্ঞতামুখে সেবা। ভৃত্য বেশ বুঝতে পারে—সেবা করছি। কিন্তু শান্ত-রতির সেবক বুঝতে পারে না, অথচ সেবা করে। জড়রসরহিত হলে সেবনযোগ্যতা আসে। যোগ্যতার আকার নেই। আমি সেবক—এ উপলব্ধি অস্ফুট। এ জন্য শান্তকে রসশ্রেণীর মাঝামাঝি বলা হয়। মুখ্যের আদিম অবস্থা দাস্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, গমনপথে এই শান্তরস। বুদ্ধ করুণার অবতার। শোকরতি থেকে যে কারুণ্য, সেটি রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শান্তরতিতে জগতের অহিংসার জন্য করুণাপ্রকাশ, তাতে শোকরতির আমেজ সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। যেমন শাক্যসিংহ তিন পা ওয়ালা (একটি মাথা ও দুটি পা—এই তিনটি) একটি বৃদ্ধকে দেখলেন। বৃদ্ধটি চলতে পারে না, তাতে একটু শোক হল—আমি পৃথিবীতে থাকতে পারবো না, এ অভাব দূর হয় কিসে? পার্থিবভোগ ত্যাগ করে অহিংস হয়ে তপস্যা করলে শোকরহিত অবস্থা হয়। এখানে অহিংস-নীতির প্রচার করলেন। কেউ কেউ এখানে জুগুপ্সারতিতে জাত বীভৎস-রসও বিচার করেন।

পরশুরামের ক্রোধরতিতে রৌদ্ররস। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বলেছিলেন—"ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত, Politics জিনিষটা intelligence এর

উপরে উঠবে। যাদের জড়-জগতের জ্ঞানে বীতস্পৃহ হবার চেষ্টা, তাদের জব্দ করে দিতে হবে, তাদের দরিদ্রতা দেখিয়ে বড় হব। ক্ষাত্রধর্ম ব্রহ্মণ্যধর্মের উপরে থাকবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—মাথা—বুদ্ধি। তাঁদের বুদ্ধি না নিলে বাহুর (ক্ষত্রিয়ের) দুর্গতি হয়।

কার্তবীর্যার্জুন আরা জেলার সাসারাম নামক স্থানে রাজ্য করতো। তার হাজার বাহু ছিল। সহস্ররাম (হাজার রকমের ভোগবুদ্ধি) হতে 'সাসারাম' হয়েছে। কার্তবীর্যাজুন জমদগ্নির কামধেনু কেড়ে নিয়েছিল। তাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে একুশবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করেছিলেন। তখন বিচার হয়েছিল—

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্"

এক ধার থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেছিলেন। চন্দ্রসেনকে পর্যন্ত বিনাশ করেছিলেন। তাঁর পত্নীর গর্ভে একটি সন্তান ছিল। তিনি পরে মসীজীবী হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। বলদেবের হাস্যরস। প্রলম্বাসুর মনে মনে অহঙ্কার করেছিল, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মেরে ফেলবে। সে গোপরূপ ধারণ করে রামকৃষ্ণের গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সর্বদর্শী ভগবান্ তার উদ্দেশ্য জানতে পেরেও তাকে বধ করবার ইচ্ছায় বন্ধু বলে স্বীকার করে ক্রীড়া আরম্ভ করলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করতে থাকলেন। প্রলম্বাসুরের মতলব হয়েছিল, বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে নিয়ে গিয়ে সংহার করবে, কিন্তু বলদেব বজ্রমুষ্টিতে তার মস্তকে আঘাত করে তার প্রাণ সংহার করলেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা। ধর্মের নামে গোপনে ব্যভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্বপ্রচার প্রলম্বাসুরের কৃত্য। বলদেব সেটা বিনাশ করে থাকেন। কনককামিনী প্রতিষ্ঠাশাকে প্রবল করবার জন্য আমাদের যত্ন; কিন্তু বলদেবের কৃপা সেগুলি বিনাশ করে থাকে। সুতরাং এখানে হাসির কথাই বটে। যাঁর রূপবৈভব হতে মৎস্যাদি অবতারসকল উদ্ভূত, তাঁতে জড়জীব মনে করে মারবে। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা নিয়ে বলদেবকে সংহার করে কংসের উপকার করবে মনে করেছিল। তাতে হাস্যরসের উদয় হয়। যার যা ক্ষমতা নেই, সেটা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্য উদিত হয়।

কল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্মিককুলকে ধ্বংস করেছিলেন। অধার্মিকগণের বিচার—ধর্ম নাশ করবে, ধর্মের প্রসার ধ্বংস করবে—খাবে দাবে নরকে যাবে। তখন উৎসাহরতির দরকার হয়।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্যাত্তত্তৎকর্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড় ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি।।

উৎসাহরতিযুক্ত হয়ে কল্কিদেব অধার্মিককুল বিনাশ করেন। উৎসাহরতির দ্বারা বীররসের আবাহন করে থাকেন অধর্মকে ধ্বংস করতে উৎসাহ প্রয়োজন। যারা বলে,—বসে বসে মালা টানবো, হরিকথা কীর্তন করবো না, কীর্তন করতে গেলে লোকে বলবে—দলো লোক, সুতরাং ভগবৎকথা প্রচার না করে সয়তানীর কথা প্রচার হতে দেব, তারা বাস্তবিকই সয়তান। নিজে ভোগ করবো, খাবো দাবো নরকে যাব—এই বিচার তাদের। যজ্ঞপত্নীগণের পুরুষগণ এক সময়ে মনে করেছিল, রামকৃষ্ণকে খেতে দেবে না, তারাই ভোগ করবে, কিন্তু যজ্ঞপত্নীগণ রামকৃষ্ণকে খাওয়ালেন। অনেক সময় এরকম বিচার আসে। সত্য নষ্ট করতে অসংখ্য লোকের চেষ্টা। বিষ্ণুভক্তি-দ্বারাই সমস্ত অমঙ্গল হচ্ছে, লোকের এরূপ বিচার। মধ্যে উৎকল-দেশের একটি লোক প্রচার করেছিল, চৈতন্যদেব উড়িষ্যাদেশটিকে মাটি করেছেন। কিন্তু তিনি সকলের মঙ্গল করেন। ঐ লোকটি বিচারে ভুল করলো; কিন্তু কতকগুলি লোক বলে—"তাই হবে, তেজোবৃদ্ধি হচ্ছে না। ছাগলের কাঁচারক্ত না খেলে উদ্দাম প্রবৃত্তি থেমে যাবে।" বিষ্ণুভক্তগণ বলেন—ওটা করতে পারবে না, জীবে দয়া কর। কিছুদিন আগে বিচার হয়েছিল —লাঠি খেলা শিখতে হবে, তা হলে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে। কিন্তু তা হতে নিবৃত্ত হয়ে নিজেকে দণ্ড দেওয়া—ত্রিদণ্ড গ্রহণ করা কর্তব্য। কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড গ্রহণ করলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হবে, নতুবা অসুবিধা হবে। সেইজন্য রূপগোস্বামী প্রভু প্রবৃত্ত জগতের মূঢ়তা নিরাসের জন্য "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের অবতারণা করেছেন।

ভজনের দ্বারা সব মঙ্গল। নিজে বাহাদুর—এই অহঙ্কারমূঢ়তা-দ্বারা সর্বনাশ হবে। প্রবল উৎসাহে হরিকথা বল। Trade বন্ধ কর। বণিগ্‌বৃত্তি জীবীরা মনে করেন, ব্যবসা করলে তাঁদের সুবিধা। তাঁদের হাতেই যা কিছু থাকবে। অপরকে

ব্যবসা করতে দিব না। তাদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু সকলকে বলে দিতে হবে—ভগবদ্‌ভক্তি ছেড়ে দিলেই ঝগড়া—Nationalism দাঁড়াবে। হে মনুষ্যজাতি, তোমরা সকলে হরিকীর্তন কর। আবিসিনিয়াবাসী, ইটালীবাসী সকলে মিলে হরিভজন কর। তা হলে আর কোন মতভেদ থাকবে না। হরিকীর্তন হলে ঐরূপ বিচার-প্রণালীর প্রয়োজন হবে না, ভজনের প্রবৃত্তি বাড়বে। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা-ব্যতীত আর মঙ্গলের কথা নেই, এটা না বুঝা পর্যন্ত রাবণের সীতাহরণ চেষ্টা। ভক্তি-রহিত হয়ে যে সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা, সে সব ঘুচে যাবে বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। ভক্তিই একমাত্র প্রযোজনীয়, তাতেই উৎসাহ-বিশিষ্ট হওয়া দরকার।

কোন রসবিশেষের প্রকাশের উপাসনায় জড়রস দূর হয়। গৌণজগতে মুখ্যরসের কথাগুলি ক্রিয়াবিশিষ্ট হলে ফলপ্রদ হবে না। অখিলরসামৃতমূর্তি কৃষ্ণের কথা আলোচনা করলে ক্ষুদ্রচিন্তা হতে নিরুৎসাহ হয়ে হরিকীর্তনে পূর্ণ উৎসাহ আসবে। পূর্ণরসের আশ্রয় হরিকে আশ্রয় করলে ঝগড়া, মৎসরতা থাকবে না।

পঞ্চদশ-দিবস

(৯।৯।৩৫)

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।

জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভাবুক বা রসিক শব্দে কথিত হন। যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়ে উত্তরোত্তর মঙ্গললাভে অগ্রসর হন, তাঁরা সাধনভক্তি আশ্রয় করে থাকেন, তাতে আটটি অবস্থা আছে। আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি---এই চার প্রকার, আর অনর্থ-নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সুযোগ হবার জন্য আর চারপ্রকার অবস্থা---নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। অনর্থনিবৃত্তির পরে এগুলি স্বাভাবিক হলে ভাবরাজ্যে প্রবেশ হয়। তাতে রতির কথা আছে। রতির সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উদয় হয়। সেটি প্রেমভক্তিরাজ্যের কথা। জাতরতি ব্যক্তিদিগের সামগ্রী-সম্মেলনে যে অবস্থা, সেটা ভাবুকের পরে রসিক-অবস্থা। অনর্থনিবৃত্ত পুরুষের ভাবের অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিতে সেবা আছে।

নিজমঙ্গল-জন্য অগ্রসর হতে যে বৃত্তি, তা শ্রদ্ধা। সেটি সাধনের প্রথম অবস্থা। যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা করতে হবে না, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সেগুলি কি জিনিষ? একটি নিজের ভোগবাসনা, কর্মাগ্রহিতা আর অপরভাগে অবস্থিত ভোগত্যাগ---দুটিই সমজাতীয় একটির বিচার---জড়জগৎ ভোগ্য আর আমি ভোক্তা; অপরটির বিচার---আমি ভোগ না করে সুবিধা পাব, ইহা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের বিচার-প্রণালী। কর্মপরের চিন্তাস্রোতে ভোগবাসনা প্রবল। আর ত্যাগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাধা, তাতে দুঃখ অধিক, যেমন গীতায় বলেছেন---

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।

যাঁরা বলেন, ব্যক্তি জগতে ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে অব্যক্তে প্রবেশ করা দরকার, তাঁদিগকে গীতা বলছেন যে---সেটায় অধিক ক্লেশের কথা। দেহীর বিচার ভোগ বা ত্যাগ নয়। দেহবিশিষ্ট-ব্যক্তি ত্যাগ করে দুঃখে না পড়ে। সেখানে (ত্যাগে) কিছুই নেই। এখানে (ভোগে) কিছু আছে মনে করাও স্বপ্নমনোরথবৎ অল্পকালস্থায়ী। এগুলির বদলে ভগবদ্‌ভক্তি আশ্রয় করা কর্তব্য। ভাবাশ্রয় যারা করল না, যাদের রতি স্থির হল না, নিজে ভোগ করে আনন্দ পাবে বা ত্যাগ করে আনন্দরহিত হয়ে যাবে, সে বিচারটি আদরের নয়। মুমুক্ষুদিগের ভোগাদেওয়া কথার মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণত্ব-বর্ণন থাকলেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃত্বের রাহিত্য হয়ে সব আমিত্বে পর্যবসিত হবে, এটাই তাদের প্রধান বিচার। 'আমি' বলে জিনিষটা নির্ণয় করা দরকার। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে তটস্থশক্তি বলে বিচার করেছেন। ভোগময় কর্ম ও ত্যাগময় জ্ঞানরাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ করে ভগবদ্‌ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। তাতে সেব্যের সুখানুসন্ধান-বিচার প্রবল, নিজের ভোগ বা ত্যাগে শান্তির কথা নেই। তখন বিচার হবে, "তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ করতে প্রস্তুত আছি, আমি সুখী হলেও যদি তোমার সুখ হয়, তাতে আমার দুঃখ নেই, সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।"

ভাগবত ভগবৎসম্বন্ধীয়---ভগবানের স্বরূপবর্ণন ও যাঁদের নিয়ে ভগবত্তা, তাঁদের কথা অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বলেছেন। আলম্বন, উদ্দীপন, সঞ্চারী ও অভ্যাগত বিচারে সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। ভাবুক রসিকসহ ভাগবত পড়তে হবে, নতুবা জড়রস আলোচনা করতে করতে রসরাহিত্য ব্যাপার আসবে। কিন্তু প্রকৃত রসের উদয় কখন হবে?

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।

কর্ম-জ্ঞানের উদ্দেশ্য নিজস্বার্থপোষণ। নিজের সুবিধা কর্মাগ্রহিতা, তাকে ছেড়ে দেওয়া জ্ঞানাগ্রহিতা, দুটোতেই অপস্বার্থপরতা। নিজেন্দ্রিয়তর্পণের দুই প্রকার রাস্তা। কামনার পরিতৃপ্তি 'ধর্ম' বলে উল্লিখিত হয়, সেটা ভাবুকের হওয়া উচিত নয়। রস আস্বাদন করতে হবে, কিন্তু সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয় না হলে তা সম্ভব

হবে না। তামসিক রাজসিক ব্যক্তির আপেক্ষিক ধর্মযুক্ত সাত্ত্বিকরসাস্বাদন ভাল মন্দের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে ভাবনাবিশিষ্ট হয়ে যে রসাস্বাদন, সেটিই প্রয়োজন---তাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। আমরা রূপগোস্বামী-প্রভুর অনুগ্রহে মহাপ্রভুর বিচার-প্রণালী মধ্যে এই বিষয় লক্ষ্য করে থাকি।

রসিক কাকে বলে? যিনি সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে রস আস্বাদন করতে পারেন। আপেক্ষিকতাধর্মপূর্ণ সত্ত্ব নয়, সাত্ত্বিক গুণে অবস্থান হলে যে ভালর বিচার, সেটাও ছেড়ে দিতে হবে। উজ্জ্বলসত্ত্ব না হলে মিশ্রসত্ত্বে অসুবিধা আনবে। অতিশয় আস্বাদন সত্ত্বোজ্জলহৃদয়ে হয়ে থাকে। রজোদ্বারা তমঃ ও সত্ত্বদ্বারা রজঃ বিনাশ করলেই হবে না, সত্ত্বটাকেও বিশুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা বিনাশ করতে হবে। ঐগুলিতে ভোগ বাসনা বা ত্যাগ-বাসনা বর্তমান। এজন্য পতিবঞ্চনা বলে মধুর রতিতে একটি কথা আছে। পারকীয় বিচার শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। সেটি প্রাকৃত সহজিয়া ব্যক্তি বুঝতে না পারায় যে অমঙ্গল ঘটে, তা আমরা পদে পদে লক্ষ্য করি।

ভাবনাবর্ত্ম---মনোধর্মকে অতিক্রম করে যে অবস্থা, তাতে যে রসের উদয়, সেটি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্বাদ্য। গুণজাত জগতকে অতিক্রম করে যে আস্বাদন, তাকেই রস বলে। তাতে পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা রসিক বা ভাবুক। নির্গুণ জগতের যে আংশিক ভাব, সেটি নয়। রসিকগণের কৃত্য ভাগবত আলোচনা করা। ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম না করায় মনোধর্ম-জীবীর চিন্তাস্রোতে রজস্তমোগুণের মিশ্র ক্রিয়া প্রবলা থাকে। তাতে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হয় না। ভগবানের রস আস্বাদন ভাগবত না হলে হয় না, ভূতশুদ্ধি না হলে দেবপূজা---ভগবৎপূজা হয় না। ভগবান্ রসময়, এটা উপলব্ধি না হলে নীরস বিরস ব্যাপারকেই প্রাপ্যজ্ঞানে দুর্বুদ্ধির উদয় হয়। এটা অতিক্রম করা প্রধান প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ভাষায়---Transcend করা, যেটাকে Transcendence বলা হয় অর্থাৎ বাস্তব বস্তুর কথা; অবস্তুর তাৎকালিক প্রতীতিকে লক্ষ্য করা হয় না। গুণজাত জগতের কথায় যে ভাব, সেটা বলা হচ্ছে না; বাস্তববস্তু-সম্বন্ধীয় ভাব ভাগবতরস আলোচনা করা দরকার। ভাগবতকে অভিধেয়-বিচারে গ্রহণ করলে অমৃত হয়। অভিধেয়াচার্য্য শ্রীরূপ-গোস্বামীর শ্রীচরণ আশ্রয় করলে ভাগবতরস আস্বাদিত হয়। নতুবা জড়রসজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা আক্রমণ করে। এ জন্য পাঁচের অল্প-

সঙ্গের কথা বলেছেন। তা হতেই ভক্তি লাভ হয়। রসিকগণের সঙ্গেই ভাগবত আস্বাদ্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।।

অরসজ্ঞ বা জড়রসজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ভাগবত আস্বাদিত হবার নয়। সেখানকার সকল কথা ভগবানের পাদপদ্মে সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ বলতে গিয়ে জড়-জগতের স্রষ্টা বা ভবানী ভর্তা---যিনি সংহার করেন, তাঁর কথা নয়। নিত্যকাল অবস্থিত যিনি, তাঁর কথা। জড়জগতে জন্ম ও ভঙ্গে যে রস-সমাগম, সে দুটো নিকৃষ্ট। তাৎকালিকতায় যে রসোদয়---ব্রহ্মার রস বা রুদ্রের রস, সেকথা নয়। কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রণেতা rhetorician যে কথা বলছেন, সব মানব ভোগতাৎপর্যপর, তাতে কৃষ্ণভোগতাৎপর্যপরতা নেই। দেখতে এক হলেও কৃষ্ণ ও তদাশ্রিত জীব-রস ভিন্ন---অচিদ্‌রাজ্যে প্রভুত্ব করার আসামীদের রস অভিন্ন-তাৎপর্যপর। ভোগ বা ত্যাগরাজ্যের রস ভাগবতরস নয়। ভোগেন্দ্রিয়ের অনুকূল-ব্যাপারে ভোগ ও ত্যাগজাতীয় ভাব সংশ্লিষ্ট। সুতরাং রসিক ও ভাবুকের সঙ্গে ভাগবত আলোচনা করতে হবে।

আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটি শ্লোকমাত্র সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে, আর কৃষ্ণ প্রকাশবিগ্রহ বলদেবপ্রভুর অবতারসমূহের রসের কথা মাত্র আলোচনা হয়েছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়---বার্ষভানবীর কুণ্ডতটে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হবে।

অবতাসং হ্যেবর মধ্যে সাতটি গৌণরস ও তিনটি মুখ্যরসোদন করতে ঐ তিনটি যদিও নিত্যরসের অন্তর্গত, কিন্তু গৌণরসের বিচার-প্রণালী তাতে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে, যাতে লোকের ভ্রান্তি হতে পারে। যেমন নৃসিংহদেব বিষয়জাতীয় বস্তু, তিনি বৎসলরসের আশ্রয়বিগ্রহের বিষয় না হয়ে বাহ্য আপাতদর্শনে আশ্রয়প্রতিম হলেন কেন? নৃসিংহদেব অবতার। অবতারী কৃষ্ণে এরূপ বিষয়-আশ্রয়ের সুষ্ঠু বিচারের বাধা হতে পারে না। তিনি প্রভু, আর আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব সেবক তদধীন। এ জন্য নারসিংহী, বামনভক্ত ও শাক্যসিংহ-ভক্তগণের মধ্যে আপাতদর্শনে রস বৈষম্য দৃষ্ট হয়। তাতে লক্ষ্য করি, ভগবান্

বিষয়; সুতরাং পিতৃত্ব-মাতৃত্বের বৎসলরসে সেবকের অধিকার আছে। প্রহ্লাদের রসের বিচার আশ্রয়জাতীয় হলেও ভগবত্তার কৃপা তাঁর উপর এল কেন? ভগবানের সুখটুকু আশ্রয় লাভ করতে পারে না। আশ্রয়জাতীয় ব্যক্তি বিষয়রূপে জগৎ ভোগ করছে। কিন্তু আশ্রয়জাতীয়ের যে ভোগ, সেটার সুষ্ঠুতা ভক্তিরসে। অভক্তির দ্বারা ভোগে আশ্রয়াভিমানের অভাব। কিন্তু প্রহ্লাদ আশ্রয়াভিমানপূর্ণ আর নৃসিংহদেবের বিষয়াভিমান পূর্ণ। এখানে আশ্রয়াভিমান বিরোধিসত্তাদ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। স্ব-পর-বিরোধিতত্ত্ববিশারদ যাঁরা, অর্থপঞ্চকের পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চার বিচারে স্ব-পর-বিরোধী প্রভৃতি বিচার তাঁরা জানেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে এগুলি আলোচ্য হয়।

বৎসলরতিতে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের অমঙ্গলনিরসন সেবা করছেন। ভক্তিপথের বাধা নষ্ট করে দিচ্ছেন। আশ্রয়জাতীয় বিচারে যে সন্দেহ, সেটা নিরাকরণ করছেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের উপাসনা করছেন, তাঁর থেকে নিজ সেবাগ্রহণের উদ্দেশে কিছু কামনা করছেন না। যেমন গোপীর অঙ্গমার্জন, সেটা কিসের জন্য? কৃষ্ণসুখের জন্য। ভোগ্যা জড়বিচারপরা ভোগিনীর নিজসুখপরা অঙ্গ-মার্জন তা হতে তফাৎ। বৎসলরসের বিষয়েও নৃসিংহদেবের সম্বন্ধে ভাল করে বিচার করলে লক্ষ্য করা যায়, প্রহ্লাদের রাজ্য বা নিজভোগবাসনা ছিল না। সেবকাভিমান প্রবল ছিল। নিজে নৃসিংহ হয়ে যাব, এ বাসনা ছিল না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনঃ" বিচার তাঁতে পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তের রসটি পূর্ণ করার জন্য ভগবানের যে অনুগ্রহ, সেটা জড়জগতের ভোগ-ত্যাগ-বিচারের মত নয়। গণেশের উপাসকগণের এখানে ভ্রম উৎপন্ন হতে পারে। তাঁরা ভুল করে বলেন---ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিরত্ন, ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন কেন? এটা ত' আমাদেরই মত অর্থাৎ জড়ের রায়সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির মত বিচার হয়ে পড়ছে? কিন্তু ব্যাপার তা নয়। উপদেশক, মহোপদেশক মহামহোপদেশক প্রভৃতি ভক্তিরাজ্যের উপাধিগুলি ঐরূপ কোন জড়ীয় বিষয় নয়। তাঁরা অন্যের তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-তোষণজন্য উপদেশ করেন না। জগতের নিত্যমঙ্গলের কথা উপদেশ করে থাকেন। আর জড়ের উপাধি নিজের জড়তোষণ বৃদ্ধি করে, উহা কৃষ্ণসেবাপর

নয়। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের কাছে কিছু প্রার্থনা করছেন না। তিনি বলেন না, আমার পিতার দেহটিকে নখ দিয়ে চিরে নষ্ট করে ফেলুন। তিনি প্রার্থনার ভার প্রভুকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জড় কামনা---আত্মতোষণ-কামনা নেই। ভক্তের সর্বাত্মদ্বারা পরমাত্মতোষণ ব্যতীত অন্য কামনা নেই, শুদ্ধ জীবাত্মার দ্বারা আত্মতোষণ অর্থে পরমাত্মার সেবা। বিষয় আশ্রয়ে ভেদ নেই। মধুরতিতে গোপীর অঙ্গ-মার্জনে কোন দোষ নেই। কিন্তু রমার অঙ্গ-মার্জনে ঈশ্বরী-বিচার প্রবল, এখানে তা নেই। বৎসল-রসের যে-বিচার, তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভক্ত সেবার জন্য প্রচুর অগ্রসর হয়েছেন। এঁর উদ্দেশ্য কি আত্মতোষণ বা বদ্ধজীবতোষণ? তা নয়। ভগবানের সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁদের কেউ বাধা দিতে পারে না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।।

ভক্ত জানেন, ভগবান্ তাঁর উপাস্য আর গণেশ মহাশয় জড়জগতের ব্যক্তিগণের সিদ্ধিদাতা—যারা ভগবানের উপাসনা করে না, তাদের ছেলে- ভুলানো কাজে আটক করে রেখেছেন। গণেশের উপাসনায় জড়সবিশেষ বিচার, পরিশেষে নির্বিশেষতত্ত্বে প্রবেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষতত্ত্বের প্রকাশবিগ্রহ নৃসিংহদেব পৃথক বস্তু। গণাধিপ---leader, জগতের যতরকম leadership আছে, সকলের শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন গণাধিপ---গণেশ; আর নৃসিংহদেব হচ্ছেন সেই গণাধিপাধিপ। জগতের কামনাপ্রিয় জনগণের শ্রেষ্ঠ হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা---নারায়ণ বা ব্রহ্ম হয়ে যাব, এসকল ক্ষুদ্র পিপাসায় যারা ব্যতিব্যস্ত, তাদের সুবিধা দেন গণেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষ বিচারপর প্রহ্লাদ মহাশয়ের ঐরূপ কুবাসনার উদয় হয় নি। যে দুশ্চিন্তা (mental speculation) মানবকে আক্রমণ করে ভোগতাৎপর্যপরতায় বিলীন করেছে, সে রকম কথা ভাগবতে নেই। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় মাধুর্য, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত বিচারের বিষয়গুলি আর জড়-

জগতের বিষয়-আশ্রয়-জনিত প্রেরণা একরকম মনে করতে হবে না। সব সমানজাতীয় নয়। তা হলে জড়ভোগী বা ত্যাগ-মহিমা পর ব্রহ্মবাদী বলবে,—"ভক্তের বাসনা ভগবানের সেবা করা; সুতরাং এখানেও কমনা আছে!" কিন্তু তা নয়। আশ্রয় জাতীয়ের নিত্যবৃত্তির যে স্বরূপগত চেষ্টা, তাতে বাসনা জাতীয় **imperfection**—অযোগ্যতা আরোপ করতে হবে না। যিনি আরোপ করেন, তিনি অভক্ত জড়বস্তুর সেবক মাত্র, অবিবেচক, তাঁর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যত্ন নেই। ভক্ত বা ভগবান্‌কে **dock** এর আসামী করে **cross examination** যোগ্যতা তাদের নেই। তারা বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সত্যপ্রতিম ব্যাপারে ভরপুর থাকায় ঐ প্রকার অসুবিধা হয়েছে।

'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ইত্যাদি।

বাস্তবিক আলয়—আশ্রয়—রসময় অবস্থা। 'রসিক' 'ভাবুক' কথাটা লক্ষ্যের বিষয়। আমরা এরকম মনে করবো না যে, জড়রসপরায়ণ সাহিত্যিকসম্প্রদায়ের কাণে হরিকথা ঢুকেছে। যেদিন ঢুকবে, সেদিন তাদের জড়রস প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে যাবে। নচেৎ উহাই একমাত্র ধ্যেয় থাকবে। তাদের ধ্যানের বিষয়—ভোগ্য জড়জগৎ। মনগড়া ক্রূরদ্বৈতবাদ যাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, তারা শুদ্ধ অদ্বৈতের কথা শুনবে না বিদ্ধাদ্বৈতেই থাকবে। জড়রসের জন্য ধাবমান হয়ে তা থেকেও বঞ্চিত। তাদের ক্লেশ অত্যন্ত অধিক। এ জন্যই গীতায় "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" অবতারণা। এরকম স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে জড়রস আস্বাদিত হলে "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" বিচারে চিদ্‌রস আস্বাদন করতে পারবে না—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" বিচার বুঝতে পারবে না। যদি সব বিচিত্রতা ব্রহ্ম হতে আসে, তা হলে তাঁকে খর্ব করার চেষ্টা কেন? এখানে **illusory energy dissuade** করেছে; **conception of truth** হচ্ছে না; কিন্তু **why should the persuasive manifestation of transcendence be ignored? I give jerk to the impersonalists; intelligentsia**-কে প্রশ্ন করছি—নির্বিশেষবাদ কি করে প্রতিষ্ঠিত হতে

পারে? ভগবান্ নিত্য সত্য বস্তু, বিমুখগণের চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী, স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায়। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম" এটা না বুঝলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা উপলব্ধি হবে না। আধ্যক্ষিকতাকে গ্রহণ করে বড় হবার চেষ্টা, ত্রিপুটিবিনাশে একীভূত হওয়ার বিচার ঠিক নয়। সুতরাং আশ্রয়জাতীয়ের কামনা ও বিষয়জাতীয়ের কামনা যেখানে পৃথক নয়, তার নাম অদ্বয়জ্ঞান।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

(ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের একথাগুলি ভাল করে আলোচনা করা দরকার। সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত সর্বশেষে আর একটি বেশ ভাল কথা বলেছেন—

সর্ব বেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্তু দ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।।

মূর্খ নির্বোধ ব্যক্তিসকল শব্দের বাহ্য অর্থ করতে গিয়ে পরবিদ্যার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করেছেন, অপরবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয়ে পড়ায় তাঁর প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়েছে। তজ্জন্যই ভাগবত শেষাশেষি এ শ্লোক বলে দিয়েছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচারপ্রণালী আধ্যক্ষিকতাদোষযুক্ত। তাদের দৌড় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অর্ধাংশ—নিম্নার্ধ পর্যন্ত। উত্তরার্ধে কিছু অধোক্ষজের বিচার আছে, অপরোক্ষ বিচারের নিম্নার্ধের ন্যায় কেবল ভোগ্যজ্ঞানলাভ-মাত্রে (**epistemological merit**-এ) আবদ্ধ নয়। যারা ভগবদ্ অনুগ্রহ পায় নি, সেইসকল অননুগৃহীত ব্যক্তি নানা প্রস্তাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তটস্থা শক্তিতে নিত্যাধিষ্ঠানের বিচার না করে **mental speculationist** (মনোধর্মী) হয়ে নিঃশক্তিক ব্রহ্মের আলোচনা করতে গিয়ে জড়দ্বৈতবাদ আশ্রয় করে। কিন্তু তারা জানে না—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম।।

অদ্বৈতবাদের বিতণ্ডা মানবজাতিকে বিপন্ন করেছে। কতকগুলি লোক, যেমন অনলহক, অহংগ্রহোপাসক, হেগেল প্রভৃতি **Transcendence**-এর কথা

বললেও তাঁদের চিন্তাস্রোত more or less pantheistic; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ঐ সকলের অনুমোদন করেন না। mysticism ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। ভোগ্য জড়ের অলৌকিকতা-বিচারই mysticism, সেটা জাড্যের অন্তর্গত। পরমমুক্তপুরুষের বিচার্য বিচিত্রতাযুক্ত লীলার কথার সহিত এক নয়। তাঁরা গুণজাত জগতের ব্যাখাতেই ব্যস্ত। এই সকলের হাত থেকে অবসর লাভের জন্য অহরহঃ ভাগবত আলোচনা করা কর্তব্য। অন্য সমস্ত পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে একমাত্র ভাগবতই সেব্য হউন। Agnosticism, Scepticism, Atheism, 'Pantheism, Henotheism, Cathenitheism সবই আধ্যক্ষিকতা---অধোক্ষজ-সেবা-বিরোধী। সে জন্য ভাগবত বলেছেন---

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।

(ভাঃ ১।৭।৬)

'ঈশ্বর' শব্দ ভোগ্যজাতীয় পদার্থ নয়। কিন্তু মানুষ অন্যায়পূর্বক কুরসে, কুপথে, অপথে এমন নেশাখোর হয়ে পড়েছে যে তারা অসুবিধার কথাগুলিকে ভাগবত প্রতিপাদ্য ব্যাপার বলতে বসেছে। তাই এবার ভাগবতের কথা বলবার প্রয়োজন হলো। কৃষ্ণের লীলারসকে জড়জগতের সাধারণ কুরসে আচ্ছন্ন করবার জন্য দার্শনিকাভিমানী কতকগুলি আধ্যক্ষিকের যে প্রয়াস, তা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হওয়া আরশ্যক। সেজন্য ভাগবত কি করে পড়তে হবে এবং ভাগবত কি বলতে বসেছেন, তার আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে। উৎসবও পরিসমাপ্ত হচ্ছে। আমরা এখানে আলোচনা করবার আর একদিন সময় পাব।

শ্রীযুক্ত ভুবনমঙ্গল মহাশয় রাসলীলার কথার আলোচনা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাতে আমরা আধ্যক্ষিকের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিচার-ভেদ প্রদর্শন করেছিলাম। তৎপ্রসঙ্গে সপ্ত-গৌণ ও পঞ্চ মুখ্যরসে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা কিছু কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। মুখ্যরসের বিচারে এখানে আপাত বিষমধর্ম উদিত হচ্ছে। বৎসলরসের আশ্রয়---বাবা মা হবেন, ছেলে কেন হয়? এ জগৎ পরজগতের বিপরীত প্রতিফলন (Perverted

reflection); গণেশ এ জগতের বিঘ্নবিনাশক হলেও ভক্তিপথের বিঘ্নবিনাশন কার্যটি তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয় না। Henotheistic thought impersonlatist school এর fabrication ছাড়া অন্য কথা নয়।

অন্য School এর লোকের বিচার হয়, আপনাদের এত বড় hall তাতে ভাগবতের কথা আলোচনা না করে flood-relief এর কথা আলোচনা করলে হয়। কিন্তু relief করলে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়ে হয় ভোগী, না হয় জ্ঞানী হবে। এ-প্রকার নশ্বর অনিত্য অন্যাভিলাষকে বহুমানন ও সমৃদ্ধ করতে দেওয়া কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষারই উচিত নয়। আমরা মনুষ্যজাতির নির্বুদ্ধিতাকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়েছি। বাস্তব-সত্য ভগবদ্দর্শন করাতে প্রস্তুত হয়েছি। বাস্তবসত্যের বিরোধী জগৎ আমাদের বাস্তবসত্যের প্রচার বন্ধ করতে পারবে না---ভাগবতকে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। ভাগবত বাস্তববস্তু---নিত্যকাল বিরাজিত।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।

ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।

(ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভগবান্‌কে আশ্রয় করে যে ধর্ম নয়, সে সবই মানুষের খেয়াল,---মনোধর্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অসৎপন্থীদিগের বিচার্য্য দ্বৈতবাদ ছেড়ে দিতে হবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য সেরূপ দ্বৈতবাদী ছিলেন না। আধ্যক্ষিকগণ যে rationalism নিয়ে দ্বৈতবাদী করবার জন্য যত্ন করেন, আমরা তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না। তাঁদের চিন্তাস্রোতের মূল্য অন্ধকপর্দকও নয়। তাঁরা ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করলে জানবেন---ভগবান্ রসময়।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।

হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ।।

ভাবুক হউন, রসিক হউন, কিন্তু চতুর্বর্গাভিলাষী কপট ভাবুক জড়রস-রসিক হবেন না---কর্মী-জ্ঞানী-স্কুলের কথায় প্রমত্ত হবেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের মতে ভাল হতে পারে, কিন্তু পরিণামে তাঁদের বিফলমনোরথ হতে হবে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘয়ঃ।।

(ভাঃ ১০।২।৩২)

মনোধর্মদ্বারা তারতম্য বিচার হতে পারে না। উহাতে আধ্যক্ষিকতাই প্রবল হয়। শিশুর যুক্তি কখনই প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। নৈমিষারণ্য স্কুলের কথা প্রচারিত হউক। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হউক। বাস্তববস্তুই বেদ্য। ভাগবতকে নিয়ে উদরভরণের যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের হয়েছে, তা থামুক। অবাস্তব বস্তুর বিচার আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। জগতের সব পুঁথি ধ্বংস হয়ে যাক। বিবিধভোগপর গ্রন্থের Library পুড়ে যাক, তাতে ক্ষতি নেই। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় করলে মঙ্গল হবে, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে, বুদ্ধিমত্তার চরমফল লাভ হবে। ভগবান তাঁর সব অবতারে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। যখন ভগবান্ কল্কিদেব অধার্মিকগণকে বিনাশ করবেন, তখন আবার শুদ্ধজীবহৃদয়ে সত্যযুগ প্রবর্তিত হবে।

যারা ভগবানকে বিশ্বের অন্যতম পদার্থ মায়িক জ্ঞান করে, তাদের জন্য ভগবান্ গীতায় বলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।। (গীতা ৯।১১)

ভগবান্ (Personality of Godhead) বলছেন—বাস্তবিক আমি মহেশ্বর। গীতার কুব্যাখ্যা আজ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যে অসুবিধা করছে, তা কি থামবে না? 'বস্তুদ্বিতীয়ং' বিচার কি মানুষ বুঝবে না?

আগামীকল্য ভাগবতের এই চরম শ্লোকের ব্যাখ্যা করব।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।।

ষোড়শ-দিবস

(১০-৯-৩৫)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।।

ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতেকিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত এই তিনটি শ্লোকে 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন'—এই তিনটি বিষয় আলোচনা করেছেন। মহাপ্রভু বলেছেন,—

বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন।।
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—'প্রয়োজন'।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন।।

বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। সম্বন্ধবিচারে আমরা জানতে পারি যে, সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাৎ বহু ব্যক্তির সহিত কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধ। সম্বন্ধ নির্ণীত হবার পর অভিধেয় বিচার অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ক্রিয়া, এবং সেই ক্রিয়ার ফল প্রয়োজন। এই তিনটি তত্ত্বই ভগবান্‌কে আশ্রয় করে আছে।

বেদশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত বেদপ্রতিপাদ্য এই ত্রিতত্ত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধবিচারে সেই অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ের আলোচনা এবং অভিধেয় বিচারে তাঁর প্রতি নিষ্ঠার কথা ও প্রয়োজন বিচারে প্রেমভক্তির প্রাপ্তিকে বিচার করেছেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষে যে শ্লোকটি আছে, তাহাই আমাদের অদ্যকার অলোচ্য বিষয়।

সর্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।

বস্ত্বদ্বিতীয় তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।।

সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত। আর সেই ভাগবত তন্নিষ্ঠ অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ। ভাগবতনিষ্ঠ জনগণই অভিধেয়বিচারে সুনিপুণ। আর 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' অর্থাৎ প্রেমভক্তিই একমাত্র লভ্য পদার্থ। 'সর্ববেদান্তসারং'—ভাগবত গ্রন্থকেই সকল বেদান্তের সার অর্থাৎ 'শ্রুতিসার বলা হচ্ছে। বেদান্ত বলতে গেলে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে বেদের অন্ত—'চরম' বুঝায়। আর সাধারণতঃ উপনিষদ্‌গুলি—শ্রুতিমৌলি বেদান্ত। সেই বেদান্তের সার হচ্ছেন ভাগবত-গ্রন্থ। তাতে কি কথা আছে? না 'ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণং'—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ একই বস্তু, ভাগবত সেই ভগবদভিন্নবিগ্রহ।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।

তিন প্রকার ভাষায় সেই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে বলা হয়। কিন্তু ভাষা ভিন্ন হলেও বস্তুটি এক। এই কথা ভাগবতে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রুতি বললেন, —'অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি'—যেটা শুনা যায় নি, সেটি যা থেকে শুনা যায়।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যিনি নিত্যকাল বর্তমান থাকেন, তিনি সদ্বস্তু—সত্যবস্তু। হে সৌম্য, অগ্রে একটি মাত্র জিনিষ ছিলেন। তাঁ থেকেই অন্য সব প্রকটিত হয়েছে। তিনি জ্ঞানময় —চেতনময় পদার্থ। অচেতন-মিশ্র বিচার তাঁতে নেই। তিনি অনন্ত—যাঁর অন্ত নেই, সান্ত পদার্থ সমূহের পূর্ণতা যাঁতে আছে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই জীব সকলের উদ্ভব।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় স চানন্তায় কল্প্যতে।।

সেই অনন্ত বহু অসংখ্য সান্ত সমষ্টি। তা হলে ব্রহ্মেরই অর্ন্তভুক্ত যাবতীয় জীব সকল। অদ্বয়জ্ঞান বস্তু যিনি, যাঁকে ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ বলা হয়, সেটিতে কোন পৃথক বিচার নেই। ভাষায় তিন হলেও বস্তুটি এক। যাঁরা পৃথক বিচার করেন, তাঁদের বিচারে ব্রহ্ম, আত্মা পৃথক বলে নির্ণীত হয়। যেমন জীবত্মা—ক্ষুদ্রাত্মা, আর বৃহদাত্মা—পরমাত্মা; কিন্তু উভয়ের লক্ষণ এক। ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণাক্রান্ত। তাহলে 'আত্ম' শব্দের অর্থ কি? আত্ম শব্দে জীব বলে বুঝায় অর্থাৎ সান্ত পদার্থ। ব্রহ্ম বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাদ্ ব্রহ্ম। অর্থাৎ বৃহৎ ও আত্মপালনকারী বলে তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলা হয়। যদি আত্মাকে পৃথক জ্ঞান করা যায়, তবে বৃহৎ নন তিনি, ইহাই সাব্যস্ত হয়। উভয়ের লক্ষণ এক, তাতে ভেদ নেই। কিন্তু বৃহত্ত্ব ও অণুত্বে ভেদ স্বীকৃত হয়। শ্রুতি উন্মাদের ন্যায় শব্দ লেখেন নি। প্রত্যেক শব্দের বৈশিষ্ট্য আছে। কেউ যদি বলেন, অদ্বয়জ্ঞানের কথা এরূপ ব্যাখ্যা করি না, তাতে ভাগবত বলছেন—

''বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।''

'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' এই দুইটি শব্দ একই লক্ষনাত্মক। 'ব্রহ্ম' বলতে বৃহৎ ও পালক, আর 'আত্ম' শব্দে যাহা বৃহৎ নহে বা পালক নহে, তা হলে ক্ষুদ্র, পাল্য—ইহাই বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দের বৃহত্ত্ব বোঝার জন্য 'আত্ম' শব্দ। 'আত্ম' শব্দ পৃথক হলে আর লক্ষণ এক হলে আত্মলক্ষণে জীবশব্দ তাঁর অংশবিশেষ বুঝায়। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে একটি সূত্র আছে—

''অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।''

তাতে বলছেন—'একে'—আথর্বনিক, অথর্ব যাঁদের আলোচ্য, তাঁদের মধ্যে একজন বলছেন। আমরা পড়েছি—

''ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ''

'ব্রহ্মদাসাঃ'—ব্রহ্ম ও ভৃত্যগণ, 'ব্রহ্মদাশাঃ'—ব্রহ্ম ও ধীবরগণ 'ব্রহ্মমে কিতবাঃ'—ব্রহ্ম এবং কিতবগণ। এগুলি অথর্ববেদে আছে। তাতে 'কিতব' অর্থে ছলনাকারী জুয়োড় বলা হয়েছে। ব্রহ্মের জুয়োড় ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ কৈতবযুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন---ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ ইত্যাদি। ব্রহ্মদাস, ব্রহ্মদাশ ও ব্রহ্মকিতব এই তিন প্রকার বলা হলো। কতকগুলি ভৃত্য, কতকগুলি কৈবর্ত ও কতকগুলি ছলনাকারী কিতব। তাতে জীবপরত্ব সুনির্দ্দিষ্ট হচ্ছে। ব্রহ্মসূত্রে আছে, আথর্বন সূত্রের মধ্যেও পাওয়া যাচ্ছে যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একই লক্ষণ। একমাত্র 'ব্রহ্ম'কে এক লক্ষণ, ব্রহ্ম নহে যে আত্মা, সেই আত্মাকে ভিন্ন লক্ষণ কেহ মনে না করেন, এজন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত 'যদ্ব্রহ্মৈকত্বলক্ষণং'--এই কথা বলেন। ব্রহ্মসূত্রে 'অংশো নানোপদেশাৎ'---এই সূত্রে যে দাস-দাশ-কিতব বলে কথা আছে, তাতে জানা যাচ্ছে---ব্রহ্ম ও ভৃত্য, আর ব্রহ্মকে যারা কপটতা-দ্বারা বিচার করে, তারা। এগুলি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-লক্ষণের পরিচয়---সুতরাং ব্রহ্ম ও আত্মা সমলক্ষণবিশিষ্ট।

বস্তুটি অদ্বিতীয়। তা হলে এই জিনিষগুলি আপনা থেকেই বস্তু নহে, পরন্তু বস্তুর শক্তি বলেই বিচারিত হয়। শক্তির দ্বারাই শক্তিমদ্বস্তুর পরিচয় হয়। আবার শক্তিমানের দ্বারা শক্তি পরিচিত হন। তা হলে উপাস্য উপাসক ভেদ হচ্ছে। শ্রুতি বলেন,---

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।।

এই সকল শ্রুতিবাক্যেও আমরা জানি যে,---ব্রহ্ম ও আত্মা পৃথক। বৃহৎ এবং বৃহৎ নহে,---এই দুইটি বস্তু একপর্যায় হলে আর এক-লক্ষণাক্রান্ত কথা বলার দরকার হত না। বস্তুটি অদ্বিতীয় হলেও তাঁর অংশের নানাত্ব স্বীকৃত। অংশ ও অংশী---এরূপ বিচার আছে। শক্তির দ্বারাই বস্তুর বিচার হউক। বস্তুটি অখণ্ড, ব্রহ্মবস্তু খণ্ডিত হবার যোগ্য নয়। খণ্ডিত হলে শক্তি হয়ে যায়। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিচারই হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচারে শক্তিবিচার আপনা থেকেই আসে। বস্তু অদ্বিতীয় হলে তন্নিষ্ঠবিচারে সেব্য- সেবক বিচার সঙ্গে সঙ্গেই আসে। বহিরঙ্গা শক্তি কিছু অন্তরঙ্গা শক্তি নহে। বহিরঙ্গা শক্তিবিচারে সেব্য- সেবকভাবের বিপর্যয়। অন্তরঙ্গা শক্তি শক্তিমত্তত্ত্বের সহিত নিত্যানন্দময় স্বভাববিশিষ্ট।

'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্‌'---একমাত্র কৈবল্য---অব্যভিচারিণী প্রেমভক্তিই প্রয়োজন। প্রয়োজনতত্ত্বে সাধনভক্তি ও ভাবভক্তির বিচার নহে। প্রেমের দ্বারা যে সেবা, সেই কেবলা ভক্তি---অব্যভিচারিণী ভক্তি---প্রেমভক্তিই প্রয়োজন।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।

যিনি গুরু এবং উপাস্যদেবে তদাত্মক---'ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ' বিচার করেন, তাঁর একলক্ষণ বিচার হয়। সেবকের ও সেব্যের কার্য পৃথক হলে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেবকের ক্রিয়া আলাদা, সেব্যের সেবক-গ্রহণ আলাদা, এরকম ধরণের কথা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানের ব্যভিচার নেই। সেব্য-সেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবাগ্রহণ করেন, তাহা উভয়ে সমতাৎপর্যপর হলেই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান না হলে সেবা হয় না। ইনি এক দিকে গতিশীল, উনি অন্যদিকে---এরকম বিচার নয়। বর্তমানে আমাদের চিত্তবৃত্তি ভগবান্‌কে ছেড়ে মায়ার প্রভু হবার বাসনা বিপরীত গতি বিশিষ্ট; কিন্তু মায়ার প্রভু হবার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্যই একমাত্র প্রয়োজনীয়। এটিই লভ্য---প্রেমা। যাতে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তাতেই প্রীতি---এতে কোন বৈষম্য নেই। এখানেই অদ্বয়জ্ঞান।

"ঈশাদপেতস্য"---'ঈশ্বর' পদার্থ হতে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হলেই অসুবিধা। প্রভুর মনোঽভীষ্টপূর্তি ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য হয়েছে, তখনই তার দুর্বুদ্ধি এসে গেল। 'বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ'---"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি"---এই বিচারটার বিপর্যয় উপস্থিত হলো। যেটা উল্টে যায়, তার যে স্বভাব তার ব্যত্যয় হলে গোলমাল হয়ে গেল। কৃষ্ণস্মৃতি বিপর্যয় হতেই অস্মৃতি। তাতে বলছেন---দ্বিতীয়াভিনিবেশ হতেই ভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা করবেন, প্রভু ব্যতীত বস্তু নেই। তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা পালনকর্তা, তিনিই বড়, তাঁর অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা করবেন,---আর অন্য রক্ষক আমার নেই (বৃহত্ত্বাৎ, বৃংহণত্বাৎ) এইটি ভক্তির বিচার। যখন অন্যের নিকট থেকে ভীতি আসছে, তখনই জানতে হবে, তার

দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্যপথ আছে, এটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবকে সেবা করার বুদ্ধিবিপর্যয় হয়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনা-ফলে জড়ভোগ আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ করায়। ভীতি হতেই স্মৃতিনাশ।

"স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময় ও জ্ঞানময় প্রভু তিনি; আমি তাঁর নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, একথা ভুলে তাঁর আনন্দবিধানের পরিবর্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মগ্ন হয়ে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা--এই ত্রিপুটীর বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে করছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্যপ্রভাবে আনন্দের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বসূত্রে এই যে অমঙ্গল এসে পড়ছে, তা বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা---এই তিনটি পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মাত্মক লক্ষণ না হলে ভেদ এসে উপস্থিত হলো। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদজাতীয় হলে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে জড়ভোগাত্মক চিন্তা দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা এলো। তাকে শ্রেয়ঃ বলে গ্রহণ করবো না; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকারবাদ নহে। তা হলে ব্রহ্ম হতে পৃথক আর একটি বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিষটা ভীতিকারক ক্ষণভঙ্গুর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্ব হয়ে গেল। বিশ্বে ভয় আছে। যে কাল পর্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজবস্তু ত্যাগ করে অক্ষজবস্তুর সেবা বা ভোগ করতে দৌড়াই, ভক্তিমান না হয়ে নিজেকে সেব্য জ্ঞান করি তৎকাল পর্যন্তই অসুবিধা---দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে---এটা ছেড়ে দিলেই ভেদ বিচার এসে যায়--ব্যভিচার অভক্তি এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর বস্তু হতে আমি পৃথক, এই বুদ্ধি হলেই সর্বনাশ হলো, ভক্তিরাহিত্য এসে ভোগী বা ত্যাগী হয়ে পড়লাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ নন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ। অধঃ কৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।

ভগবদ্‌বস্তুর সংজ্ঞা---যে বস্তু নিজের আত্মসংরক্ষণ করতে পারেন, মানুষ যাকে সেবক করতে পারে না, যিনি ভজনীয় বস্তু, সেবক বৈষ্ণব নহেন, তিনি বিষ্ণু, সেব্য বস্তু, সেবক নন। কিন্তু যখনই সেব্য-সেবকবিচারে ভেদজ্ঞান উপস্থিত

হয়, তখনই অসুবিধা---দ্বিতীয়াভিনিবেশ এসে যায়। ভগবান ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আসছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট; ভগবদতিরিক্ত পদার্থ বিচার এলেই আত্মার নিত্যাবৃত্তি ভক্তি নষ্ট হলো। আমি নিত্য ভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দবিধানই আমার ভজন এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিত্যা শুদ্ধা পূর্ণ মুক্তা বৃত্তি, এই তিনটি তখনই ছেড়ে দেওয়া হলো। আমাদের বুদ্ধি বিপর্যস্ত হলে তাঁকে ভুলে যাওয়া হলো। যখনই 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ'---বিচার আসে, প্রভুপাদপদ্ম আশ্রয় করবার বুদ্ধি হয়, তখনই ভয় শোক চলে যায়। শোক যায় কখন? যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে, আমাকে তার পাল্য-বিচার আসে। সেইটাই ভক্তি। তা যখন **regain** করি, পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তখনই জানি---

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ - - - ইত্যাদি।

আমার প্রভু কেহ নেই, কর্তৃত্বাভিমানে নিজেকেই কর্তা বলে বিচার করে নিই। উহা 'অনয়া মীয়তে' রাজ্যের কথা। মাপা কার্যের যে বিচার, তাতে পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তুকেই মাপতে পারি, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। যা বৈকুণ্ঠ নয়, তাকেই মেপে নেবার ধৃষ্টতা করতে পারি। তিনি অধোক্ষজ না হয়ে আমাদের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলে তিনি ত আমাদের সেবকই হয়ে গেলেন, প্রভু থাকলেন কিসে? যিনি নিত্যসেবকের নিত্যসেবা সর্বদা গ্রহণে সমর্থ এবং নিত্যসেবককে সেব্য সাজিয়ে বঞ্চনা করেন না এবং নিজে ভৃত্যের কার্যে প্রশ্রয় দিয়ে বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় রজ্জুতে ওতঃপ্রোত বন্ধন করে অন্যাভিলাষ, ফলভোগে ও ফলত্যাগে প্রধাবিত করান না, তিনিই নিত্যপ্রভু। তাঁর সেবা করলেই সব হবে। ভক্তিযোগ মধ্যস্থানে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে ভক্তি। এ ছেড়েই অভক্তিযোগ, তাতে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ ও কর্মযোগ প্রভৃতির বিচার। তারা ভবভীত ব্যক্তি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাই তাদের প্রয়োজন। অনিত্যবিচার প্রবল হলেই বুভুক্ষা হতে জাত ক্লেশ হতে পরিত্রাণ-চেষ্টাই মুমুক্ষা। সেটা কেবলা ভক্তি নয়। কেবলা ভক্তিই সর্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া 'একয়া ভক্ত্যা গুরুদেবতাত্মা' এটাই হলো বুধ বা পণ্ডিতের বিচার। নতুবা অপণ্ডিতকে নির্বোধ হয়ে যেতে হয়, ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ে নির্বোধ প্রবিষ্ট হয়। ভোগীসম্প্রদায় বিলাস-

পরায়ণ। তাদের বিচার—চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করবো, অপরা বিদ্যার অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করে নেবো, প্রত্যক্ষবাদী হয়ে আমি নিজে জানবো বা পরোক্ষবাদী হয়ে অন্যে যাঁরা misguided হচ্ছেন, তাঁদের নিকট শুনবো, কর্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে জ্ঞানমিশ্রা বা কর্মমিশ্রা ভক্তির পথে প্রবিষ্ট হবো। এই প্রকার অভক্তির পথ ছেড়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিপথই গ্রহণীয়।

মুক্তির জন্য যে ভগবদুপাসনা, তার চেয়ে কপটতা কিছুই নেই। তুমি থাক বা না থাক, আমার সুবিধা হোক, তোমাকে বঞ্চনা করে dismiss করলাম, আমি তুমি এক---এ বিচারগুলি অত্যন্ত কপটতা। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের বিচার এরূপ নয়। 'তৎ' শব্দ পূর্বের ও 'ত্বং' শব্দ পরের কথা। পূর্বশব্দ 'তৎ' ব্রহ্ম এবং পর শব্দ 'ত্বম্' জীবাত্মা। তৎ ত্বম্---পূর্বশব্দে কথিত যে ব্যাপার, পরশব্দে কথিত ব্যাপার তল্লক্ষণাক্রান্ত। 'ওহে জীব, তুমি তৎ ব্রহ্মলক্ষণবিশিষ্ট---ইতর ব্যাপার নহ'। 'তুমি' একথা পরবর্তী সময়ের কথা। তৎ---ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মের অণু হলেও ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্ত মাত্র, বৃহদ্বস্তু তুমি নহ। ব্রহ্ম এবং আত্মার একতালক্ষণযুক্ত তুমি, এর দ্বারাও স্থিরীকৃত হচ্ছে (অবশ্য আনন্দতীর্থপাদ 'তৎ' শব্দে ষষ্ঠীর পদ করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতেও 'তৎ' তস্য তাঁর তুমি, তিনি সেব্য, তুমি সেবক এই বিচার হচ্ছে।) সেব্যসেবকভাবরহিত হলেই অনর্থ উপস্থিত হয়, ভয় আসে, তদীয়বিচার বিলুপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাং শোকমোহভয়াপহা।।

অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি হলেই ভয়শোকমোহাদি দুরীভূত হয়। অক্ষজবস্তুর প্রতি ভক্তি বা সেবার ছলনা ভোগ বা ত্যাগে পর্যবসিত। যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রহণের (senscous jurisdiction) মধ্যে আসে, সেটা আমাদেরই তাঁবেদার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হয়ে পড়ে। ওটা আধ্যক্ষিকের বিচার। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন ভগবান্ হতে পারেন না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

ভগবানে ভক্তি না থাকলে সে বস্তুকে জয় বা তাঁর অভিজ্ঞান লাভ করা যায় না।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।"

এ বিচার ছাড়লে বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবিষ্ট হতে পারি না, অনর্থযুক্ত হয়ে থাকি। একমাত্র অব্যভিচারিণী—অন্যাভিলাষজ্ঞান-কর্মাদিরহিত ভক্তি—

"কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যোজ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদিয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।

—প্রভৃতি যে বিচার, সেই একা অব্যভিচারিণী ভক্তিগ্রহণ ব্যতীত জড়-জগতেরই অধীনতা স্বীকার করতে হচ্ছে; জড়াতীত জগতে যেতে পারছি না। জড়জগতে ভেদজাতীয় বিচারের মধ্যে পরস্পরের যে বৈষম্য বর্তমান, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। জড়ান্তর্গত রূপরসাদি আমাদিগকে গ্রাস করছে। এই রূপরসাদির মালিক কে? এ সকল কাহার ভোগ্য? এ বিচার না আসা পর্যন্ত—আমাদের এই বদ্ধভাব না ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান

উপলব্ধি হচ্ছে না। কৃষ্ণপাদপদ্মকে অধোক্ষজ না জানলে ঐতিহাসিক বা রূপক কৃষ্ণের উপাসনায় কি সুবিধা? অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা করলেই অনর্থ যাবে। 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে' এটি ব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের বিশেষ উপদেশ। ব্যাসের বেদবিভাগ-পুরাণ-রচনাদি কার্যে যে অবসাদ, বুদ্ধিহীনতা ও ভীতি এসে উপস্থিত হয়েছিল, তাতে নারদ অধোক্ষজে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের কথা উপদেশ করলেন। ভয়নাশিনী বৃত্তি আত্মায় উদিত না হলে, ভীত হওয়ার যোগ্যতা আত্মাতে থাকলে কোন সুবিধা হবে না।

"তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলম্
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।"

মানুষ যেকাল পর্যন্ত না চব্বিশ ঘন্টা ভগবৎপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত না হবে, সেকাল পর্যন্ত মায়াদেবী তাকে গ্রাস করবে, বহুরূপিণী মায়া তার ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পদার্থ হবেন। আমি ভোগ করবো, **Upper hand** আমার, তাদের **Lower office**—এটা ভোগী কর্মীর বিচার--প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর নিম্নার্ধের বিচার। অপরোক্ষবাদের উন্নতার্ধে অধোক্ষজের কথা বুঝবার একটু চেষ্টা লক্ষিত হয়। অধোক্ষজ বিচার এলেই সমস্ত অমঙ্গল কেটে যায়।

জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ।।

—বিচারটি ভাল করে বুঝা দরকার। যিনি নির্বৃত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁর, তাঁর হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য নেই। সর্বক্ষণই হরিকথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। 'কো নির্বৃতঃ' বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। এমন কোন মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ করে ইতরকথায় নিবিষ্ট থাকবেন। ভক্তিপথই কৈবল্যসম্মত পথ। যাঁরা পৃথিবীতে মানুষ হতে পেরেছেন, তাঁদের জন্যই এই ভক্তিপথ। রাজযোগ, হঠযোগ এগুলি বাহ্য কৈতবাশ্রিত লোকের জন্য। হরিসেবাপরায়ণ মনুষ্যদের জন্য উহা নয়। ব্যভিচারিণী যুক্তি

ভক্তি নয়। অক্ষজ-পদার্থকে ঈশ্বরত্বে স্থাপন করা, আমি সেব্য, ঈশ্বর সেবক—এই বিচার হতে দুটা সর্বনেশে বিচার এসে উপস্থিত হচ্ছে।

এক প্রকার—স্বর্গ **Paradise**, বেহেস্তার সুখ আমি ভোগ করবো, ঈশ্বরকে ভোগ করতে দেবো না। শতকরা শত ভাগই ঈশ্বর ভোগ করবেন এ বিচার ছেড়ে দিয়ে আমি ভোগ করবো। আবার আর এক প্রকার—ত্যাগী হয়ে নিজেই ঈশ্বর হয়ে যাবো। অথবা ভোগও করবো না, ত্যাগও করবো না, ঈশ্বরকে সেবা করবার নামে বঞ্চনা করবো, ফল নিজে পাব, ঈশ্বর হয়ে যাবো,ঈশ্বর কোন কাজের নয় সাব্যস্ত হবে—এগুলো অত্যন্ত দুর্বুদ্ধি। সদানন্দযোগীন্দ্র যেমন বলেছেন—"সদসদ হতে পৃথক অনির্বচনীয় অজ্ঞানসমষ্টির নাম ঈশ্বর।" আমাদের কথা তা নয়। তিনি আর একটি জিনিষ। ভাগবতের এই 'কৈবল্যসম্মত' কথাটি যাঁরা আলোচনা না করেছেন, তাঁরা কৈবল্যৈকপ্রয়োজন বুঝতে পারবেন না। 'কেবল' শব্দ কি, তা ভক্তের কাছে না বুঝে যাঁরা নির্বিশেষ-মতাবলম্বিগণের নিকট বুঝতে যান, তাঁরা মায়াবাদাশ্রয়ে নির্বোধ। তাঁদের সঙ্গে আলাপ কেন করবো? শ্রীমদ্ভাগবত সর্ববেদান্তসার, তাঁর বিচার থেকে চ্যুত হয়ে জড়জগতের লোকের খেয়ালীর বিচারে আমরা মনোযোগ দেবো না। তার থেকে শত যোজন দূরে থাকবো। তাঁদের বিচার বালভাষিত—'পরোক্ষবাদোবেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্'—এই বিচার করবো। তাদের কথার জবাব দেওয়াও অপ্রয়োজনীয়। অতি শিশু নির্বোধ জড়জগতের কাম ক্রোধে আচ্ছন্ন বা এগুলো ছেড়ে দিয়ে যারা একটা কাল্পনিক অবস্থা মনে করে তাতে ব্যস্ত—**ordinary economy** নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, **Transcendental economy** হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়, তাদের সঙ্গ দরকার নেই, তাদের সঙ্গ হতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকবো। জ্ঞানটা যখন গুণোর্মি-চক্রে আর ঘুরে না, তখনই ভক্তিমার্গে রুচি আসে। রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ, জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এতে জ্ঞানকে চালিয়ে দিলে যে-মূর্খতা আসে, তা অপনোদনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত—

"অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।"

—এই শ্লোকে অধোক্ষজে ভক্তির বিচার বলছেন। অধোক্ষজ কে? কৃষ্ণই সেই অধোক্ষজ ভজনীয় বস্তু। গুণোর্মিচক্রে যতক্ষণ জ্ঞান ঘুরতে থাকে, প্রতিনিবৃত্ত হয় না, ততক্ষণ ভগবদ্বস্তুই যে কৃষ্ণ, এটি উপলব্ধি হয় না—ভজনীয় বস্তু ভক্ত, ভজনের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। ভক্তিই যে পরম প্রয়োজনীয়, এ বিচার আসে না। নিত্যসেবকের স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হচ্ছে না। নিত্য হরিসেবক যদি অভিমান করেন, আমি পুরুষ-স্ত্রী, মুর্খ-বিদ্বান্ রোগী-সুস্থ, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, তা হলে অমঙ্গলের পথই বরণ করা হয়। ভাগবত বলেন—

"কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।"

দৃষ্ট লৌকিক বিনাশী পদার্থ ভোগ করতে গিয়ে অসুবিধা হয় বলে মানুষ অদৃষ্ট পদার্থের স্তাবক হতে যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ দৃষ্ট ও ভোগকল্পিত অদৃষ্ট—উভয়কেই নশ্বর বলে বিচার করেন। অদৃষ্ট—যা দেখে নি অথচ গল্প করছে অর্থাৎ ভোগ বা ভোগের বিপরীত ভাবটা, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষায় তাৎকালিকতা বা অনিত্যতারূপ নশ্বরতা দেখে থাকেন। ইহাতে সচ্চিদানন্দত্ব কখনই প্রযুক্ত হতে পারে না। ব্রহ্মার লোক পর্যন্তও পতিত হবার—অমঙ্গল বরণ করবার যোগ্যতা থাকবে। উহা নিত্য নয়, নশ্বর। আমরা **Realist, Idealist** নই, বিশ্বকে মিথ্যা বলি না, উহা সত্য কিন্তু নিত্যসত্য নয়, নশ্বর—

শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।।

—এইরূপ বিচার।

যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ—যখন আমাদের রজঃসত্ত্বতমোগুণের ফুটবল হতে ইচ্ছা থাকবে না, তখনই তাতে অসঙ্গ হবে; কিন্তু যখন বলবো রজোগুণের দ্বারা তমঃকে বিনাশ করতে হবে, অমনিই রজঃ-সত্ত্ব-তম তিন ভাই এসে মারামারি করবে; যেহেতু তোমরা বলছো রজো দ্বারা তমো ধ্বংস করবে, অথচ সত্ত্বগুণের

monopolise করাবে, তাকে ধ্বংস করবে না, এ কি রূপ কথা? আমরা বলবো সত্ত্বকেও ধ্বংস করতে হবে; বিশুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিনাশ করতে হবে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।।

অধোক্ষজ 'বাসুদেব' বস্তুই আমাদের সেব্য হউন। আমরা যেন বলতে পারি—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তিঃসম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্ মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

আমাদের শত সহস্র চেষ্টা দ্বারা **heaven and earth move** করলেও সেই **unconquerable** জিনিসটি পাব না। **As an empericist** আমরা অনন্তকোটিকাল ধরে জ্ঞান সংগ্রহ করলেও শেষে **to infinity** বলে গোঁজামিল দেবো, **series develop** করবার সময় নেই বলবো। গণিতশাস্ত্রে যে প্রকার গোঁজামিল দিয়ে থাকি, সেই বস্তুতে সেরূপ গোঁজামিল চলবে না। ভক্তি ব্যতীত অন্য গতি নেই। ভগবানকে ইন্দ্রিয়জাত পদার্থবিশেষ জ্ঞান করতে হবে না। প্রাকৃত পদার্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বিচার আছে। এই প্রকৃতিজাত উপাধিদ্বয়ের অতীত বস্তুই অপ্রাকৃত। আমরা 'অধোক্ষজ' শব্দে **Transcendental** বলে **Hegalian School**-এর একটা শব্দ বলি, কিন্তু এ দ্বারা অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃতের ভার সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হচ্ছে না। যেখানে বৈচিত্র্য বলা হচ্ছে না, সেখানে **Transcendental** অতি ক্ষুদ্র কথা। আমরা বাস্তবিকই খুব বড় কথা বলতে বসেছি। পরমমুক্ত পুরুষের বিচারই ভক্তি। ভক্তিযোগই কৈবল্যসম্মত পথ।

যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্‌গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।

গুণাতীত বস্তু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ কর। তাঁর ভজন কর। তিনি আপেক্ষিক সত্ত্বগুণের অন্তর্গত বস্তুমাত্র নহেন। তাঁ হতে গুণসকল নির্গত হয়েছে, অভক্ত-সম্প্রদায়কে দূরস্থ করবার জন্য। তাঁ থেকে শিক্ষা লাভ করে যাতে শোধন হতে পারেন, সে রকম বিচার হচ্ছে। অরণং—শরণং, একমাত্র গতি তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত সেই অধোক্ষজ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করতে বলেছেন। সন্তঃ—সাধুসকল; কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী এরা সব অনিত্য-বিচারপর অসাধু। সৎকর্মপরায়ণতা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যাওয়ার বিচার—সবই অসৎ, অর্থাৎ এরা চিরদিন একরকম থাকে না, মুক্তিলাভেও এদের অবস্থার পরিবর্তন হয়। কিন্তু ভক্তের তাদৃশ পরিবর্তন বা পতন নেই। ভোগত্যাগাদি বদ্ধবিচারমুক্ত ভক্ত, কখনই অভক্তসহ সমপর্যায়ে গণিত হতে পারেন না।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।।

—ইত্যাদি শ্লোকে বিমুক্তমানী ও ভক্তের কি সুন্দর বিচার প্রদত্ত হয়েছে; যার বিরুদ্ধ কথা মনুষ্যজাতি বলতে পারে না। যদি বলে, **Balance loose** করে বলবে, নিজের ওজন না জেনে। বাস্তবসত্যের কথা আলোচনা হলে অন্যান্য

সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক বিচার থেমে যায়। অনর্থযুক্ত জীব বেদান্তের যে অর্থ করছেন, অনর্থমুক্তেরা সে অর্থ স্বীকার করেন না। সেজন্য মুক্তানর্থ ব্যক্তির দ্বারাই উপনিষদের ব্যাখ্যা দরকার। যেমন রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বেদান্তের ব্যাখ্যা করেছেন। অনর্থযুক্তেরা ভগবানকে অধোক্ষজ বিচার না করে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা পার্থিব নিজ ভোগ্য পদার্থ বিশেষ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন পদার্থ বিচার করছেন। যেমন দ্বারকায় কৃষ্ণ এলে চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য দ্বারদেশে গিয়ে কৃষ্ণকে খবর দিতে দ্বারীকে বললেন। ব্রহ্মা মনে করলেন, তিনি ত' একমাত্র সৃষ্টিকর্তা; কৃষ্ণ, দ্বারকা সবই তাঁর সৃষ্টির অন্তর্গত। কৃষ্ণ বুঝলেন, ব্রহ্মার অহঙ্কার হয়েছে, তাঁকে (কৃষ্ণকে) তাঁর ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন। তখন কৃষ্ণ দ্বারীকে দিয়ে বলে পাঠালেন, কোন্‌ব্রহ্মা এসেছেন জিজ্ঞাসা করে এস। ব্রহ্মা দ্বারীর নিকট সে কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—এ আবার কি, আমিই ত' ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মা কে? নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অভাব-দর্শনে ভগবানের হাস্যরসের উদয় হলো। কৃষ্ণ ব্রহ্মার মনোভাব জেনে তখনই অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাদের স্মরণ করলেন। তাঁর স্মরণ মাত্রেই অসংখ্য ব্রহ্মা এসে তাঁদের মস্তকস্থ কিরীট দ্বারা কৃষ্ণ পাদপদ্ম বন্দনা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে ডাকিয়ে এই ব্যাপার দেখাতে ব্রহ্মা নির্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে গেলেন।

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে।।
দশ বিশ শত সহস্র অযুত লক্ষ বদন।
কোট্যর্বুদ মুখ কারো না যায় গণন।।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন।।
দেখি চতুর্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।

সনকপিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্রজ্ঞানে এক কোণে বসে থাকলেন। ব্রহ্মা নিজের ভ্রম বুঝে তখন বলছেন,—

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।।

[যাঁরা বলেন, 'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁরা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি এই মাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।]

ব্রহ্মা বললেন অন্যে যা বলে বলুক, আমি আর ঐরূপ অবিবেচনার কথার মধ্যে ঢুকবো না। তখন থেকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলো। পদ্ম-পুরাণে বলেছেন—

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।

চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।।

আমরা আমাদের গুরুপরম্পরায়ও দেখছি—শ্রীকৃষ্ণব্রহ্মা দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্ ইত্যাদি। এখনও পর্যন্ত সত্যকথা, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করলে জান্‌তে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকে ধ্বংস (?) করার জন্য প্রচুর চেষ্টা চলেছে, কিন্তু তা' সফল হয় নি—ভাগবত-সম্প্রদায়কে কেহই বিনাশ করতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদীদের কেহই এই গ্রন্থখানির টীকা করতে সাহসী হন নি। কেন না, প্রতিবাদ করলেই নিজেদের বিচার- দৌর্বল্য ধরা পড়বে। কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি শ্লোকের টীকা করেছেন; কিন্তু করলেও তা মায়াবাদ-হলাহলপূর্ণ। কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত—সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। মানুষ মনুষ্যের রচিত গ্রন্থ পড়ে দুর্গতি বরণ করছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের আলোচনা না করে ভ্রমে পড়ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় না করাই দুর্বুদ্ধির পরিচয়। এইজন্য বলছিলাম—

সর্ববেদান্তসারং. . . . . কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্।

আমি বলছিলাম যে, ভাগবতের কৈবল্য পাতঞ্জলির ঈশ্বরসাযুজ্য বা আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসাযুজ্য নয়, ভগবৎসাযুজ্যও নয়। "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"—বিচারে হরি যাদের বধ করেন, তারা যে ভগবৎ সাযুজ্য লাভ করে, 'কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্' বলতে তা নয়। সুরসকল ভগবদ্ভক্ত। তাঁদের কার্য

জীবের মঙ্গলের জন্য; মনুষ্যজাতির সেবার ভার দেবতারা নিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে polytheistic theory আমাদের অনুসরণীয় নয়। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' এ বিচার যাদের উদিত হয় নি, তারা বিষ্ণুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য জীবমাত্রই যে নিত্যবৈষ্ণব, এটা বুঝতে পারে না। নিত্য আত্মার অনুভূতিতে সনাতন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কথা নেই। ভক্তিই আত্মার নিত্য অবস্থা, তা না বুঝে তার সঙ্গে অনিত্য অবস্থার ধর্মকে এক করে বসে। তারা ভক্তিটা অন্যত্র ব্যবহার করে ক্ষুদ্র দেশাত্ম, সমাজাত্ম, গৃহাত্মবোধে গৃহব্রতধর্মে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। 'ভক্তি' শব্দটি দেশ সমাজাদিতে প্রযুক্ত হতে পারে না। সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। একমাত্র ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ, তাঁতেই সকল জীবাত্মার সর্বতোভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁর অন্যান্য অবতারে রসের অপূর্ণতা ও স্বল্পতা, কিন্তু পূর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র তাঁতেই আছে। Dr. Macnical Kennedy এবং তাঁর অনুবর্তিজনগণ বিষয়টা ভাল করে ধরতে পারেন নি। তাঁদের প্রকৃত ভাগবতালোচকের সঙ্গে দেখা হয় নি। কেবল Benares School-এর কয়েকটি ও বিশিষ্টাদ্বৈতধারার কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে মাত্র। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যবোধ ভাগ্যহীন ভগবন্মায়াদ্বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইজন্য ভাগবত বলেছেন—

"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।

পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।"

আপনারা জানবেন অতি সহজ ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবতের বর্ণনীয় বিষয়টি—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্

রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।।"

—এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। ইদনীন্তন ভাষায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং তদ্বিভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ।।"

—এই দশমূলশিক্ষা শ্লোকে বর্ণন করেছেন। এইগুলি বিশেষভাবে আলোচনা দরকার। অদ্য আমাদের আর সময় নেই। আজ শেষ দিবস বলে আপনাদের অনেকটা সময়কে আক্রমণ করা হলো। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁর প্রচারকার্যের শেষে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, আর ভাগবতপারম্পর্যে অবস্থিত হয়ে শ্রবণ করেছিলেন আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম; (শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যোক্তি) কিছু কিছু অস্ফুটভাবে আমাদের কর্ণকুহরেও তা এসে পৌঁছিয়ে ছিল। আমরা তোতাপাখীর মত তা বলবার কিছু প্রয়াস করছি। আপনারা সুষ্ঠুভাবে সকল কথা শ্রবণ করুন, পাঠ করুন, বিচার করুন—

তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।

বর্তমান শুদ্ধভক্তিস্রোতের পরিচালক যিনি, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আগামীকল্য আবির্ভাব-তিথি। আজ অধিবাস। আগামীকল্য তাঁর কথা বিশেষভাবে আলোচনা হবে। আজ এখানকার শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ ব্যাখ্যার দিনে তাঁর কথা আংশিকভাবে কিছু আলোচনা হলো। তিনি যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর কথা জগতের সর্বত্র আলোচনা হোক, এইটিই আমার প্রার্থনা। জগৎ তাঁর কথা বুঝুক—শ্রীরাধাগোবিন্দগোপীনাথের উপাসক হোক, শ্রীগোপীনাথের উপাসনা হলেই কামাদি যাবে। আপনারা জানেন, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ বলেছেন,—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।।

যে জন্য আমাদের গৌড়ীয়মঠের প্রবর্তন, সেই গোপীনাথের সেবা—পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী, অর্চার বিচার জগৎকে আমরা সুষ্ঠুভাবে দিতেও পারি না, জগৎ নিতেও প্রবৃত্ত নয়। (অর্চার দিকে লক্ষ্য করিয়া) আপনাদের সম্মুখে যে অর্চা বিগ্রহ, তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ আপনারা তাঁকে দর্শন করুন।